আমাদের নাট্যগবেষণা : একটি অসমাপ্ত প্রতিবেদন

মলয় রক্ষিত

নান্দীমুখ

আমরা যারা নাট্য-গবেষণার সঙ্গে যুক্ত, নাট্য-গবেষণা নিয়ে ক্লাসে পড়াই, বক্তৃতা করি — প্রায়শই আমরা গবেষণা করতে গিয়ে নানা সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন হই। সাহিত্য অথবা সমাজবিদ্যার অন্যান্য শাখাগুলিতেও গবেষণার ক্ষেত্রে কমবেশি সমস্যা থাকতে পারে, থাকেও। আর্থিক সাহায্য পাওয়া না পাওয়ার কথা আমি বলছি না। আমাদের মতো গরিব দেশে সরকার অথবা ইনস্টিটিউট গবেষণার জন্য টাকা ঢেলে দেবেন — এমন আশা নিয়ে গবেষকরা কেউই গবেষণা করতে নামেন না। আর অর্থ যদি-বা পাওয়া যায়ও তবু সমস্যা কিন্তু এতটুকুও মেটে না। কেন না, গবেষণার মূলে আছে যে গবেষণা-উপাদান — মূলত তথ্য — অভাব অনেক সময় সেটারই। তথ্য অপ্রতুলতার সমস্যা, তথ্য-সংগ্রহের সমস্যা, তথ্য যাচাই-এর সমস্যা, সংগ্রহশালায় যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করবার সমস্যা, তথ্য যদি বা থাকে সেই তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার সমস্যা — ইত্যাদি হাজারও সমস্যার মুখোমুখি একজন গবেষককে হতে হয়। কিন্তু সমাজবিদ্যার শাখা হিসেবে, ইতিহাস বলুন, সাহিত্য বলুন, ভাষা বলুন — তথ্য একরকমভাবে থাকেই। মানে এই সমাজ-পরিবেশে সেই সব উপাদানে কোনও না কোনও উপায়ে সেগুলি আছে। আপনি উদোগী হলে সেগুলো একক প্রচেষ্টায় হোক বা যৌথ প্রচেষ্টায় সংগ্রহ করতে পারবেন। অসংখ্য প্রাচীন পুথি, পুরনো দুষ্প্রাপ্য বইপত্র, দলিল দস্তাবেজ, চিঠিপত্র, ডায়রি, হিসেবের খাতা — ইত্যাদি কারও না কারও বাড়িতে আছে। এখনও এখানে ওখানে মাটি খুঁড়লে বেরিয়ে আসে প্রাচীন যুগের মাটির পাত্র, ভাঙা আধভাঙা পাথরের মূর্তি, প্রাচীন সৌধের ধ্বংসস্তূপ। গবেষক চাইলে সেই আবিষ্কৃত উপাদানগুলি যাচাই করে, গবেষণার নতুনতর কোনও তথ্য সংযোজন করতে পারেন, পুরনো স্বীকৃত কোনও তথ্যকে ভুল বলে বাতিল করতে পারেন। সমাজবিদ্যার অনেক শাখাতেই এটা সম্ভব — ইতিহাসে, সাহিত্যে, দর্শনে, ইকনমিক্সে, সামাজিক-বিদ্যায় এটা সম্ভব। কিন্তু নাট্যজগতে, বিশেষত নাট্য-প্রযোজনার — লাইভ পারফরম্যান্সের উপর গবেষণা করতে গেলে ঠিক ওই জায়গাতেই আমরা আটকে যাই। নাট্য-গবেষণার প্রধান সমস্যাই নিহিত আছে উপাদান ও তথ্যের অপ্রতুলতায়, এবং যে উপাদান ও তথ্য পুনরুদ্ধারের কোনও সম্ভাবনা নেই।

এবার একটু পরিষ্কার করে নেওয়া যাক নাট্য-গবেষণা বলতে আমরা কী বোঝাতে চাইছি। নাট্য শব্দটার তাৎপর্য অনেক বিস্তৃত। কেন না, নাট্য — যা আদতে বোঝায় একটি নাট্য-প্রযোজনাকে, লাইভ

পারফরম্যান্সকে — সেটা একটা কালেকটিভ আর্ট, মিশ্র শিল্প। কলাশিল্পের অনেকগুলি শাখা একসঙ্গে একই আধারে মিলে-মিশে একটাই লাইভ আর্ট নির্মাণ করে। যেমন ধরা যাক, নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে নাটকের টেক্সট্ একটা উপাদান। কোনও নাটককার সেই টেক্সট্টা লিখেছেন, সেটা হাতের লেখায় স্ক্রিপ্ট হতে পারে, মুদ্রিত টেক্সট্ হতে পারে, পত্রিকায় বা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত টেক্সট্ও হতে পারে। এই টেক্সট্টাই নির্দেশকের হাতে এসে পৌঁছল। নির্দেশক সেটা থেকে মঞ্চের উপযোগী টেক্সট্ তৈরি করবেন, সেটা একটা চলমান প্রক্রিয়া হতে পারে। তিনি সেটার মধ্যেই যাপন করবেন, বাড়িতে, রিহার্সাল স্পেসে, এমনকি প্রতিটি শো-র পরে ইচ্ছে মতো সেটার পরিবর্তন করবেন। শম্ভু মিত্রের ভাষায় সেটা নিছক নির্দেশকের 'শর্টহ্যান্ড নোটস্' মাত্র হতে পারে (শম্ভু মিত্র, 'শিশিরকুমারের প্রয়োগকলা সম্পর্কে', 'সন্মার্গ সপর্যা', এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স্ প্রঃ লিঃ, আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ১০০-১০৩)। তাহলে নাটকের টেক্সট্ কোনও ধ্রুব একক নয়, সেটা সাহিত্য হতে পারে আবার নাও হতে পারে, তার লিখিত রূপ মানে টাইপ-করা অথবা হাতে লেখা রূপ — সেটাও থাকতে পারে আবার নাও পারে। নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে এখন আর টেক্সট্টা আবশ্যক কি না — এটাও একটা লাখ টাকার প্রশ্ন। ওয়ার্কশপ-ভিত্তিক প্রোডাকশন হতে পারে, তাতে টেক্সট্ বলে আদৌ কোনও বস্তু নাও থাকতে পারে। কিন্তু টেক্সট্ যদি থাকে — সেটা যে-কোনও ফর্মেই থাকুক না কেন — নাট্যগবেষণার ক্ষেত্রে একটা জরুরি উপাদান।

এইবার টেক্সট্-এর পাশাপাশি আসতে পারে কবিতা, গান, নাচ, মাইম-এর কৌশল এবং অভিনেতার শরীরী অভিনয়-কলা। অভিনয়ের ক্ষেত্রে কণ্ঠশিল্প খুবই জরুরি উপাদান। সঠিক-উচ্চারণ, স্বরক্ষেপণ এবং আবৃত্তির কৌশল শিখতে হয় অভিনেতাকে, রীতিমতো অনুশীলন করেই তা আয়ত্ত করতে হয়। পাশাপাশি নাচ, গান, মূকাভিনয় এমনকি অ্যাক্রোব্যাটস্ — জিমন্যাসটিক্সও জানতে হতে পারে। এগুলো যদি অভিনেতার নিজস্ব শিল্প হয় — শরীরী শিল্পেরই এক-একটা অঙ্গ হয়, তাহলে এর বাইরে আছে স্টেজের নেপথ্যশিল্পীদের শিল্পগত উপাদান। মঞ্চনির্মাণ করছেন যে শিল্পী — তিনি একাধারে চিত্রশিল্পী — থিয়েটার ডিজাইনার। তাঁর উদ্ভাবনী ক্ষমতায় মঞ্চের পরিসরে নির্মিত হচ্ছে বাস্তবের প্রতিরূপ, কিংবা সামান্য উপকরণের উপর শিল্পিত টাচ্-এ স্থবির মঞ্চ হয়ে উঠছে ব্যঞ্জনাময়। পোশাক-পরিকল্পনা করছেন যে শিল্পী, উদ্ভাবনা তিনিও রাখছেন। তেমনি রূপসজ্জার পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ করছেন যে শিল্পী তাঁকে হয়ে উঠতে হয় দক্ষ বহুরূপী। আলোকশিল্পী দিচ্ছেন আলো-ছায়ার খেলা, সেই আলোছায়ার প্রক্ষেপণের বিচিত্রতায় তৈরি হয় হাজারও নাট্যমুহূর্ত। সংগীতশিল্পী দিচ্ছেন শব্দ এবং সংগীত, নানান তাল বাদ্যের উপকরণে তিনি আবহসংগীত নির্মাণ করছেন, সেও মিশে যাচ্ছে নাট্যশরীরে। নৃত্যশিল্পীর ইনপুটও নাট্যশরীরে জরুরি হতে পারে, যেমন জরুরি হতে পারে কোরিওগ্রাফি। দেবেশ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি সিনোগ্রাফি শব্দটা প্রয়োগ করছেন, যেটার অর্থ 'নির্দেশক'-এর কনসেপ্টকে ছাড়িয়ে আরও বহুদূর বিস্তৃত হতে পারে। সবমিলিয়ে থিয়েটার বা নাট্য-প্রযোজনা একটা বহুমাত্রিক শিল্প — আবার বহুমাত্রিক হয়েও সেটা একক। উনিশশো ছেষট্টি-সাতষট্টি সালে 'টোটাল থিয়েটার' বলে একটা কনসেপ্ট খুব চালু হয়েছিল, সেটা নিয়ে কিছু সেমিনার লেখালেখি ইত্যাদি হয়েছিল। থিয়েটারের সব কটি শিল্পগত উপাদানের প্রয়োজন মতো কিন্তু ঠিকঠাক মাত্রার মিশ্রণে জন্ম নেয় যে শিল্পরূপ — সেটাই টোটাল থিয়েটার। সুতরাং নাট্য-প্রযোজনা এমন এক কম্পোজিট আর্ট — যা বিচিত্র কলাশিল্পের ঠিকঠাক সমন্বয়েই গড়ে উঠতে পারে। নাট্যপ্রযোজনা একদিকে যেমন বিচিত্র কলাশিল্পের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা মিশ্রশিল্প, তেমনি আবার তা এমন এক শিল্প যেটা একেবারেই তাৎক্ষণিক। লাইভ পারফরম্যান্স হিসেবে তার বৈশিষ্ট্য এবং মজা এখানেই যে, প্রতিটি শো-এর রাতে তার নতুন-নতুন জন্ম হয় এবং পরমুহূর্তেই তার মৃত্যু ঘটে। দর্শকের স্মৃতিতে সেই মুহূর্তগুলি হয়ত অনেকদিন বেঁচে থাকে, কিন্তু তা দিয়ে গবেষণার কাজ চলে না। গবেষণা

চায় পাথুরে প্রমাণ, চায় তথ্য, চায় টাটকা আঁখো-দেখা অভিজ্ঞতার বিবরণ। তাই নাট্য-প্রযোজনাকে ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য বাঁচিয়ে রাখতে পারে একমাত্র প্রতিবেদক ও সমালোচকের কলম। প্রতিবেদক তথ্য-সহযোগে নাট্যাভিনয়ের বিবরণ লিখে রাখেন, আর সমালোচক তাকে কাটা-ছেঁড়া করে, বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে ভাল-মন্দের তুল্যমূল্য হিসেব দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাই সংবাদপত্রে বা ম্যাগাজিনে প্রতিবেদন এবং সমালোচনা হয়ে উঠতে পারে নাট্য-গবেষণার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান।

কিন্তু শুধু প্রতিবেদন ও সমালোচনা দিয়ে নাট্য-গবেষণার কাজ চলতে পারে না। প্রতিবেদন কিংবা সমালোচনা একটি নাট্য-প্রযোজনায় অভিনীত নাটকটির কাহিনি, অভিনয়, কস্টিউম, রূপসজ্জা, স্টেজ-ডিজাইন, লাইট, মিউজিক-আবহ-সাউণ্ড ইত্যাদির ভাল-মন্দের হিসেব দিতে পারে। কিন্তু সেটা নাট্য-গবেষণার কোনও পূর্ণতার পরিচয় বহন করে না, প্রযোজনার একটি মাত্র দিককেই তা প্রতিভাত করতে পারে — লাইভ অভিনয়। নাট্য-গবেষণার পরিসর কিন্তু আরও বৃহৎ — তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নির্মাণ করতে হলে নাট্য-প্রযোজনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত সমস্ত উপাদানের কাছে আমাদের পৌঁছতে হবে। সেই সমস্ত উপাদানগুলি থেকে নিষ্কাষণ করে নিতে হবে প্রকৃত তথ্য।

কী কী হতে পারে নাট্য-গবেষণার উপাদান? অন্যভাবে বলতে গেলে, একটি থিয়েটার-সংগ্রহশালা গড়ে তুলতে গেলে — কী কী থাকবে সেই সংগ্রহশালায়? সংরক্ষণের তালিকাটা হতে পারে এরকম :

ক) সংবাদপত্রে/ম্যাগাজিনে প্রকাশিত থিয়েটারের বিজ্ঞাপন
খ) নাট্য-প্রযোজনার প্রচার-উদ্দেশে লেখা পোস্টার, হ্যাণ্ডবিল, প্রকাশিত লিফলেট বা ব্রোশিওর
গ) প্রযোজনার দেখার জন্য দর্শনী/টিকিট অথবা গেস্ট কার্ড
ঘ) প্রযোজিত নাটকটির শো যে থিয়েটার হলে হয়েছে, সেই প্রেক্ষাগৃহের নকশা ও সিট প্ল্যান
ঙ) প্রোডাকশন-খরচ ও টিকিট বিক্রিবাবদ লাভ-ক্ষতির বিবরণ সমৃদ্ধ হিসাবপত্রের খাতা
চ) সংবাদপত্র/ম্যাগাজিনে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও সমালোচনা
ছ) প্রযোজিত নাটকটির রিহার্সাল-টেক্সট্ এবং মুদ্রিত টেক্সট্
জ) প্রোডাকশন দেখে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে কেউ অভিনন্দন-বার্তা জানিয়ে থাকলে, সেই সমস্ত চিঠি
ঝ) নির্দেশকের কোনও ডায়রি থাকলে, তাঁর আঁকা স্কেচ, লেখা নোটস্/বয়ান যদি থাকে
ঞ) স্টেজ-ডিজাইনার/কোরিওগ্রাফারের প্রাথমিক পরিকল্পনার কোনও স্কেচ/লে-আউট থাকলে সেটি/এবং স্টেজ-ডিজাইনে ব্যবহৃত প্রপস্, সেট এবং অভিনয়ের জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য উপাদান
ট) থিয়েটার হলে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন ধরনের আলো, শব্দযন্ত্র, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি
ঠ) অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পোশাক
ড) রূপসজ্জার নানান উপকরণ
ঢ) প্রযোজনার বিভিন্ন মুহূর্তের ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর, নাট্যসংক্রান্ত অনুষ্ঠানের ও আলোচনার ছবি
ণ) নাট্যমঞ্চের রূপ, মঞ্চের যন্ত্র-প্রযুক্তি ও স্পেস-নির্ভর বিভিন্ন মঞ্চের মডেল নির্মাণ ও সেগুলির সংরক্ষণ

উপরের তালিকার সবগুলি উপাদানই কোনও না কোনওভাবে নাট্য-প্রযোজনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। একটি আদর্শ থিয়েটার আর্কাইভ গড়ে তুলতে গেলে এই উপাদানগুলি থাকা জরুরি। এই উপাদানগুলির পাশাপাশি আর্কাইভে থাকবে নাট্য-গবেষণার আরও কিছু প্রাসঙ্গিক সাহায্যকারী

উপাদান। যেমন —

ত) নাটকের টেক্সট্, রিহার্সাল ও মঞ্চের সম্পাদিত টেক্সট্
থ) নাটক ও থিয়েটারের তথ্যাবলির ইতিহাস-সম্বলিত গ্রন্থ
দ) নাট্যব্যক্তিত্বদের স্মৃতিকথা ও জীবনীগ্রন্থ
ধ) নাট্যব্যক্তিত্বদের সাক্ষাৎকার, তার অডিও/ভিডিও রেকর্ড
ন) নাট্য-বিষয়ক প্রবন্ধ ও আলোচনা-গ্রন্থ
প) নাটকের পত্রিকা
ফ) নাটকের দল অথবা নাট্য-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত নিউজ লেটার অথবা বুলেটিন
ব) নাট্যদলগুলির/নির্দেশকের প্রাপ্ত স্মারক/পুরস্কার, মানপত্র ইত্যাদি
ভ) নাট্য-বিষয়ক অনুষ্ঠান — যেমন ওয়ার্কশপ ও আলোচনা-চক্রের অডিও/ভিডিও রেকর্ড ও প্রতিবেদন

বলা বাহুল্য, আজকের এই ডিজিটাল ভার্সনের যুগে, থিয়েটারের সংগ্রহশালা শুধু বস্তুগত উপাদানই সংগ্রহ করবে না, যে-সমস্ত উপাদানের ডিজিটাল সংরক্ষণ সম্ভব, সেগুলির ডিজিটাল রূপান্তর সংরক্ষণ করবে। নাট্য-প্রযোজনার লাইভ অভিনয়ের ভিডিও রেকর্ডিং এখন প্রায় সব বড় দলগুলি করে থাকেন। ডিজিটাল আর্কাইভের যুগে কোনও লাইভ-অভিনয়ের এই ভিডিও রেকর্ড হয়ত কখনই সেই অরিজিনালিটির ধারে-কাছে থাকতে পারে না, কিন্তু নাট্য-গবেষণার ক্ষেত্রে এই ডিজিটাল রূপটি যে খুবই মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে, তা নিয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না।

বাংলা নাট্য-গবেষণার হালহদিশ : প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি

বাংলা নাট্য-গবেষণার আদিতেই আছে তথ্যের অভাব ও অপ্রতুলতা, এবং নাট্য-সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা না থাকা। বাংলা পেশাদার রঙ্গমঞ্চের কথা যদি বলি, বা তার আগের বাবুদের শখের থিয়েটার কিংবা তারও আগে গড়ে ওঠা কলকাতার ব্রিটিশ থিয়েটারের কথা, তাহলে বলতেই হয়, আমাদের নাট্য-গবেষণার পক্ষে তা প্রায় অন্ধকারের যুগ। শুধু পেশাদার থিয়েটারের কথাই বা বলছি কেন, বিশ শতকের চারের দশকে গড়ে ওঠা গণনাট্য বা গণনাট্য ভেঙে তৈরি হওয়া নবনাট্য তথা গ্রুপ থিয়েটারের ক্ষেত্রেও নাট্য-সংরক্ষণের এমন কোনও ব্যবস্থা ছিল না, যাকে বাংলা নাট্য-গবেষণার পক্ষে অনুকূল বলা যায়। মোদ্দা কথা হল, বাংলা থিয়েটারের কিঞ্চিৎ-অধিক দু'শো বছরের ইতিহাসে নাট্য-উপাদান এবং তথ্য সংরক্ষণের কোনও চিন্তা-চেতনা কোনওকালেই ছিল না। নাট্য-গবেষণার পক্ষে এ গভীর দুঃখের এবং হতাশার। এই প্রেক্ষিত থেকে কেউ প্রশ্ন তুলতেই পারেন যে, তাহলে এই দু'শো বছরের বাংলা নাট্যজগৎ নিয়ে যে-সমস্ত ইতিহাস বই রচিত হয়েছে, অসংখ্য গবেষণা-সন্দর্ভ লেখা হয়েছে, সেগুলি কীভাবে সম্ভব হল?

সন্দেহ নেই, অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। কিন্তু এর উত্তরে বলা চলে, বাংলা নাট্যজগৎ নিয়ে যে-সমস্ত গবেষণা-গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেগুলির কোনওটিকে আদৌ নাট্য-গবেষণা বলা যায় কি? বাংলা নাট্যজগৎ নিয়ে যেসব বই-পত্র লেখা হয়েছে, বা গবেষণা-সন্দর্ভ রচিত হয়েছে, ক্যাটাগরিক্যালি সেগুলি যদি বিচার করা যায়, তাহলে কতকগুলি বর্গে ফেলা যেতে পারে (প্রতিনিধিস্থানীয় কিছু বইকেই এখানে আমি উদাহরণ হিসেবে রাখছি) :

(ক) বাংলা নাটকের ইতিহাস বা নাট্য-সহিত্যের ইতিহাস :

> 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' : অজিতকুমার ঘোষ, 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস' (দুই খণ্ডে প্রকাশিত) : ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা' : বৈদ্যনাথ শীল, 'নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার' : ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, 'বাংলা নাটকের বিবর্তন' : সুরেশচন্দ্র মৈত্র, 'বাংলা ঐতিহাসিক নাটক সমালোচনা' : সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

বলা বাহুল্য এই বইগুলিতে নাটককে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতোই একটি শাখা হিসেবে গণ্য করে, নাটককার ধরে ধরে সেগুলির ধারাবাহিক ইতিহাসের বিবরণ বা রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। নাটক এখানে একেবারেই মুদ্রিত টেক্সট্ — সাহিত্যের অন্যান্য শ্রেণির মতোই একটি শ্রেণি মাত্র। সাহিত্য হিসেবেই টেক্সট্গুলির ভাল-মন্দ, ভুল-ত্রুটি-দুর্বলতা ইত্যাদি বিচার করা হয়েছে। এই আলোচনা কোনোমতেই রিহার্সাল-স্পেসে সম্পাদিত টেক্সট্ নয়, মঞ্চের টেক্সট্ নয়, প্রোডাকশন-টেক্সট্ নয়, ওয়ার্কশপ-ভিত্তিক নির্মিত টেক্সট্ নয়। বস্তুত, বাংলা নাটকের ইতিহাস বা তার বিবর্তনের এই যে ইতিহাস, সেটা অনেকক্ষেত্রেই মঞ্চাভিনয়-নিরপেক্ষ একটা গবেষণা বলা যেতে পারে। সুতরাং এই ধারাটিকে প্রত্যক্ষভাবে নাট্য-গবেষণার পর্যায়ে ফেলা যায় কি না সেটা তর্কসাপেক্ষ। যদিও উল্লেখ করা দরকার, সুরেশচন্দ্র মৈত্র তাঁর 'বাংলা নাটকের বিবর্তন' বইটিতে টেক্সট্ হিসেবে নাটকের যে বিবর্তনের ধারা আলোচনা করেছেন, তাতে নাটকগুলির অভিনয়ের গুরুত্বকে স্বীকার করা আছে, নাটকগুলির মধ্যে প্রতিফলিত নাট্যভাবনার সূত্রগুলিকে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আছে।

(খ) বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস :

> বঙ্গীয় নাট্যশালা : ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : কিরণচন্দ্র দত্ত, মধ্যযুগের বাংলা নাট্য : সেলিম আল দীন, বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস : অজিতকুমার ঘোষ, কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয় : অমল মিত্র, একশ বছরের বাংলা থিয়েটার ১৮৭২-১৯৭২ : শিশির বসু, The Story of the Calcutta Theatre : S K Mukherjee, বাংলা থিয়েটার : কিরণময় রাহা, বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক : পুলিন দাস, রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ : সমকালীন প্রতিক্রিয়া : রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়, সাজঘর : ইন্দ্র মিত্র, অথ নট ঘটিত : সূত্রধার, বিলিতি যাত্রা থেকে স্বদেশি থিয়েটার : সুবীর রায়চৌধুরী সম্পাদিত, নাটমঞ্চ নাট্যরূপ : পবিত্র সরকার, গণনাট্য আন্দোলন : দর্শন চৌধুরী, 'রঙ্গালয়ে বঙ্গনটী' : অমিত মৈত্র, 'বাংলার মঞ্চগান' : দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলার নাট্যসংস্কৃতির ইতিহাস : শেখর সমাদ্দার, অন্যধারার থিয়েটার উৎস থেকে উজানে : সন্ধ্যা দে, 'বাংলা নাট্য-সমালোচনার কথা' : আশিস গোস্বামী, 'থার্ড থিয়েটার : অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ' : বিশাখা রায় প্রভৃতি...

এই বইগুলির মধ্যে সাধারণভাবে সালতারিখ ক্রম অনুযায়ী বাংলা থিয়েটারের ধারাবাহিক বিবরণই পাওয়া যাবে। আবার এগুলির মধ্যে কয়েকটিতে ভিন্নতর ইতিহাস লেখার প্রয়াসও আছে। ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় নাট্যশালা আমার কাছে বাংলা থিয়েটারের ব্যতিক্রমী একটি ইতিহাস-নির্মাণের চমৎকার মডেল। উনিশ শতকের পেশাদারি মঞ্চের অভিনয়-কলা ও অভিনয়-শিক্ষার খুঁটিনাটি, মঞ্চসজ্জা তথা স্টেজ-ক্রাফ্ট, থিয়েটারের নাচ-গান, কোরিওগ্রাফি, রূপসজ্জা, পোশাক এমনকি দর্শকরুচি — প্রভৃতির

প্রথম একটি সমালোচনা-মূলক ইতিহাস লিখেছেন ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় — ওরফে ব্যোমকেশ মুস্তাফি। সুবীর রায়চৌধুরী সম্পাদিত 'বিলিতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার'-এ বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস সম্পর্কে একটি স্পষ্ট থিসিস আছে। সূত্রধার রচিত 'অথ নট ঘটিত' কিংবা ইন্দ্র মিত্র-র 'সাজঘর' তেমনি চেনা সাল-তারিখের বাইরে — বিহাইণ্ড দ্য স্টেজ — নানান ঘটনা ও সংঘাতের মৌখিক ইতিহাসকে তুলে ধরেছে, থিয়েটারের উপাদানগত তথ্য নির্মাণে যেগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ১৭৯৫-১৯২০' বাংলা থিয়েটারের রাজনীতি, অর্থনীতি, আপস ও সংগ্রামের সমাজতত্ত্ব — ইত্যাদির ভিন্নতর ইতিহাসকে সামনে এনেছে, অনেক প্রচলিত ধারণাকে নস্যাৎ করেছে, প্রচলিত ভুল তথ্যকে যাচাই করে, সেই ভুল-ত্রুটিগুলি সংশোধন করেছে। অমিত মৈত্র বাংলা মঞ্চের সেকেলে অভিনেত্রীদের নিয়ে তাঁর পরিশ্রমী গবেষণায় থিয়েটারের এক মূল্যবান ইতিহাসকে তাঁর গ্রন্থে ধরে রেখেছেন। দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় তেমনি পুরনো দিনের বাংলা মঞ্চগানের গীতিগুলি সংগ্রহ করে, তার সুর সংরক্ষণ করে এবং সেগুলি অনুশীলনের (ডেমনেস্ট্রেশন) মধ্যে দিয়ে গানগুলির পুরনো ঐতিহাসিক মেজাজ ও চরিত্রটিকে এখনও পর্যন্ত ধরে রেখেছেন। ঐতিহাসিকভাবে মঞ্চগান নিয়ে দেবজিত্বাবুর এই গবেষণার মূল্য অপরিসীম।

আমাদের থিয়েটারের ইতিহাস লেখার সবচেয়ে বড় অসুবিধাই হচ্ছে তথ্যগত উপাদানের অভাব ও অপ্রতুলতা। কেননা তথ্যগত উপাদান সংরক্ষণের ব্যাপারে আমাদের অবহেলা ও উদাসীনতা প্রায় পাহাড়প্রমাণ। তারই মধ্যে চিন্তা-চেতনায় ব্যতিক্রমী কিছু মানুষ অমানুষিক পরিশ্রমে ভবিষ্যতের নাট্য-গবেষকদের জন্য বেশ কিছু উপাদান সংগ্রহ করে সেগুলিকে গ্রন্থভুক্ত করেছেন। নাট্য-গবেষণার এই ব্যতিক্রমী ধারাটিই লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে গেছে বেশি। এই ধারাটিই সবচেয়ে অবহেলিত — অপঠিত। দেখে নিই সেই ব্যতিক্রমী ধারার কাজ কোনগুলি :

(গ) বাংলা থিয়েটারের উপাদান সংগ্রহ, তথ্য-কোষ ও অভিধান :

> 'বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান' (প্রথম খণ্ড ১৮৭২-১৯০০, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯০১-১৯১০, তৃতীয় খণ্ড ১৯১১-১৯২০) : শংকর ভট্টাচার্য, 'নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর ১৯৪২-১৯৮৬' : সুনীল দত্ত, 'গ্রুপ থিয়েটারের সন্ধানে' : স্বাতী লাহিড়ী, 'বাঙালি মননে মঞ্চ ও নাটক' : বিষ্ণু বসু সম্পাদিত, 'সংসদ বাংলা নাট্য অভিধান' : বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বাংলা নাট্যকোষ (প্রথম খণ্ড- আ-ঝ) : সম্পাদনা কমল সাহা, 'ইলোরা' নাট্য-পত্রিকার নাটকের বর্ষকথা (২০০৮ থেকে এযাবৎ নাট্যজগতের তথ্যপঞ্জিকরণ) : সম্পাদনা মলয় ঘোষ, 'পঞ্চাশে একশো' (Documentation of Last Fifty years of District Theatre 1960-2010) : অশোকনগর নাট্যমুখ কর্তৃক প্রকাশিত।

হাতে গোনা কয়েকটি বইকেই এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত করেছি। তার মধ্যে 'বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান' নামক তিন খণ্ডে গ্রন্থিত এই মহাগ্রন্থটিতে শংকর ভট্টাচার্য সাল-তারিখ ধরে ধরে সেই সংশ্লিষ্ট বছরটিতে কলকাতার থিয়েটার হলগুলিতে পর-পর কী কী নাটক অভিনয় হচ্ছে, প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সংবাদপত্রে প্রকাশিত সেই নাটকের বিজ্ঞাপন এবং সমালোচনা উদ্ধার করে সাজিয়ে দিয়েছেন। এতে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইতে তথ্য হিসেবে স্থান পাওয়া অনেক তথ্যই যে ভুল ছিল — তারিখের ভুল, নামের ভুল — সবই তিনি প্রমাণ দাখিল করে দেখিয়েছেন। বাংলা নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন-প্রচলনের পিছনে গ্রেট ন্যাশনালে অভিনীত একটি বিতর্কিত নাটকের কথা আপনাদের কারও কারও

হয়ত মনে থাকতে পারে। ১৮৭৬-এ যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্-এর কলকাতায় আসা এবং হাইকোর্টের উকিল জগদানন্দ রায়ের বাড়ির অন্দরমহলে পা রাখা; ইত্যাদি ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে সেই ব্যঙ্গনাটক অভিনীত হয়। 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' — হ্যাঁ ঠিক এই তথ্যটিই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' বইতে আছে। এবং অধ্যাবধি বাংলা থিয়েটারের প্রায় প্রতিটি ইতিহাস গ্রন্থেই সেই তথ্য নির্দ্বিধায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শংকর ভট্টাচার্যই প্রথম ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত তাঁর ওই গ্রন্থে 'স্টেট্স্ম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬-এর বিজ্ঞাপনটি উদ্ধার করে দেখিয়েছেন নাটকটির নাম 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' ছিল না — ছিল 'গজানন্দ ও যুবরাজ'। (শংকর ভট্টাচার্য, পৃ.১২৪-১২৫, 'বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান' প্রথম খণ্ড ১৮৭২-১৯০০, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, আগস্ট ১৯৮২) ১৯৮৪ সালে এই তথ্য আবিষ্কারের পরে কেটে গেছে আরও বিশ-বাইশ বছর। একমাত্র শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়ই প্রথম তাঁর গ্রন্থে ওই তথ্যভ্রান্তির বিষয়ে আলোকপাত করেছেন, গবেষকদের সতর্ক করেছেন। (শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', সাহিত্যলোক, ২০০৯) কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায় সমস্ত নাট্য-গবেষকদের কাজে সেই ভ্রান্তিরই পুনরাবৃত্তি দেখেছি।

লক্ষণীয়, শংকর ভট্টাচার্য তাঁর বইকে মোটেই থিয়েটারের ইতিহাস বলে দাবি করেননি, বলেছেন — 'রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান'। অর্থাৎ বলা যায় — সংগৃহীত তথ্যপঞ্জি। যে তথ্য সংগৃহীত থাকলে ইতিহাসটা লেখা সম্ভব। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় শংকর ভট্টাচার্য লিখেছেন — ''আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ের বয়স শতাব্দী পার হয়ে গেছে, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই শতাধিক বর্ষের ইতিহাস অদ্যাবধি অলিখিত। এমনকি, সাধারণ রঙ্গালয়ের উনিশ শতকের সমগ্র ইতিহাস এখনো রচিত হয় নি" (শংকর ভট্টাচার্য, ''গ্রন্থকারের নিবেদন", 'বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান' প্রথম খণ্ড ১৮৭২-১৯০০, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, আগস্ট ১৯৮২)। এই উপাদান যদিও নাট্য-প্রযোজনার নয়, মঞ্চের পরিসরে সৃষ্ট কলাশিল্পের নয়, তবু নাট্যধারার ইতিহাস লিখতে গেলে, জানতে গেলে এই তথ্য-সংকলনের গুরুত্ব যে অপরিসীম তা স্বীকার করতেই হবে।

শংকর ভট্টাচার্যের গবেষণার কাজ ১৯২০-তেই থেমে গেছে, কেউই সেটা এগিয়েও নিয়ে যাননি। তাঁর গবেষণায় অনুসৃত মডেলটি পরবর্তীকালে আর কোনও গবেষক অনুসরণই করেননি। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত সুনীল দত্তের 'নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর' এবং ১৯৯৫-এ প্রকাশিত স্বাতী লাহিড়ীর 'গ্রুপ থিয়েটারের সন্ধানে' বইদুটি আমাদের গণনাট্য-পরবর্তী আধুনিক নাট্য-আন্দোলনের উপাদান সংগ্রহ বলা চলে। নাট্য-আন্দোলন সম্পর্কিত আলোচনা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, লিফলেট, ব্রোশিওর, পত্রিকায় ও বুলেটিনে প্রকাশিত নাটক-অভিনয় সম্পর্কিত প্রতিবেদন ও সমালোচনা, চিঠিপত্র ইত্যাদি থেকে প্রাসঙ্গিক লেখাগুলিকে উপাদান হিসেবে তাঁরা সংগ্রহ করে সাজিয়ে দিয়েছেন। আধুনিক গণনাট্য ও গ্রুপ থিয়েটারের ইতিহাস লিখতে গেলে গবেষকদের যে-তথ্যগত উপাদানের দ্বারস্থ হতে হবে, সুনীল দত্ত ও স্বাতী লাহিড়ী তাঁদের বই-দুটিতে সেই গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহশালা আমাদের জন্য সাজিয়ে রেখেছেন। সুদূর বোলপুর থেকে প্রকাশিত 'ইলোরা'-র বর্ষকথা-র সংখ্যাগুলি তেমনই বছর বছর নাট্য-গবেষণার গুরুত্বপর্ণ উপাদানগুলি; বিশেষত নাট্যসংবাদ, পুরস্কার/সম্মাননা, নাট্য-প্রতিযোগিতা, নাট্য-কর্মশালা, নাট্যোৎসব, বিতর্ক, সেমিনার এবং তৎসহ অভিনীত নাটক, নাট্যদল বা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা, নাট্যমঞ্চের হাল-হদিশ প্রভৃতি ভবিষ্যতের গবেষকদের জন্য সংকলিত করে রাখছে। বাংলা নাট্যজগৎ এর জন্য 'ইলোরা'-র মলয় ঘোষের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। অসম্পূর্ণ হলেও অভি চক্রবর্তীর অশোকনগর নাট্যমুখ যে ডিস্ট্রিক্ট থিয়েটারের ডকুমেন্টেশনের কাজটি করেছেন, বাংলা নাট্য-গবেষণার পক্ষে তা খুবই প্রয়োজনীয়। অমানুষিক পরিশ্রমে, প্রায় একক প্রচেষ্টায় বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় যে 'বাংলা নাট্য-অভিধান' প্রস্তুত করে গেছেন, বাংলা

নাট্যজগৎ সে কারণে তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। বৈদ্যনাথবাবুর এ-কাজও হয়ত কিছু ভুল-ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতাকে ধারণ করে আছে। কিন্তু সেই ভুলগুলিকে সংশোধন করা, অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণতা দেওয়ার আরব্ধ কাজটি ভবিষ্যতের কোনও গবেষক করবেন। সংগ্রাহক-সংকলক কমল সাহা যে 'বাংলা নাট্যকোষ' গ্রন্থের পরিকল্পনা করেছেন তার প্রথম খণ্ডটি হাতে পেয়ে খানিক হতাশই হয়েছি। এই কোষগ্রন্থে তিনি তথ্য-বিন্যাস ও তথ্য পঞ্জিকরণের যে-পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তাতে সবক'টি খণ্ড হাতের কাছে থাকলেও পাঠকের পক্ষে সেই তথ্যাবলির ঐতিহাসিক ক্রম বা ধারাবাহিকতাকে ধরা মুশকিল। শংকর ভট্টাচার্য যে পদ্ধতিতে ১৮৭২ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের উপাদান বিন্যাস ও পঞ্জিকরণ করেছেন, সেটিই আমার দেখা সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি, সবথেকে ব্যবহারযোগ্য ও গবেষণার উপযোগী।

(ঘ) সংবাদপত্র, নাট্য-পত্রিকার সংরক্ষণ ও সংকলন :

> 'থিয়েটার : একটি ব্যতিক্রমী নাট্যপাক্ষিক' : সংকলন ও সম্পাদনা মলয় রক্ষিত, 'সাময়িক পত্রে বাংলা মঞ্চ ও নাটক' : ড. শিপ্রা দত্ত, 'এপিক থিয়েটার' (সংকলন ১-৩) — সংকলক ও সম্পাদক অরূপ মুখোপাধ্যায়, 'ভিন্ন প্রথার থিয়েটারের মুখপত্র ঋতম্' : সংকলন ও সম্পাদনা আশিস গোস্বামী, 'অন্য রীতির নাট্যপত্র অঙ্গন' : সম্পাদনা দেবাশিস চক্রবর্তী (বাদল সরকার নাট্যচর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রকাশিত)...

বলে নেওয়া দরকার, দু'শো বছরের বাংলা নাট্য-ইতিহাসের যাবতীয় তথ্য-উপাদান প্রধানত এখন ছড়িয়ে আছে অসংখ্য সংবাদপত্র এবং নাট্যপত্রগুলির মধ্যে। সেকালের দৈনিক সংবাদপত্রের মধ্যে 'স্টেট্‌সম্যান', একালের 'আনন্দবাজার পত্রিকা' কিংবা 'যুগান্তর' বাংলা নাট্যপ্রযোজনার প্রতিটি বিজ্ঞাপনকে ধারণ করে রেখেছে তার পাতায়, কত নাটকের গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে বাংলা ও ইংরেজি দৈনিকগুলিতে। পাশাপাশি এসেছে নাটকের নিজস্ব পত্রিকা বা মুখপত্র। বিশ শতকের শুরুতেই অমরেন্দ্রনাথ দত্তের পৃষ্ঠপোষকতায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রথম বাংলা নাট্যপত্রের সূচনা হয়েছিল। পরে এই ধারাতেই 'নাট্যমঞ্চ', 'নাট্যমন্দির' 'নাচঘর', 'সচিত্র শিশির'-এর যুগ হয়ে অসংখ্য নাটকের পত্রিকা জন্ম নিয়েছে। কালের নিয়মে বহু নাট্যপত্রই হারিয়ে গেছে, অথবা অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে। গ্রুপ থিয়েটার পর্বে 'বহুরূপী', 'গন্ধর্ব', 'এপিক থিয়েটার', 'গ্রুপ থিয়েটার' 'থিয়েটার', 'থিয়েটার বুলেটিন', 'ঋতম্', 'অঙ্গন', 'অভিনয়-দর্পণ', 'অভিনয়', 'স্যাস', 'নাট্য আকাদেমি পত্রিকা', 'নাট্যচিন্তা' — এরকম অসংখ্য নাট্যপত্রের মধ্যে বাংলা নাট্য-ইতিহাসের হাজারও উপাদান ছড়িয়ে আছে। কিন্তু, খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত থিয়েটারের বিজ্ঞাপনগুলির কোনও সংকলন আজও করা হয়নি। করা হয়নি তার কোনও সংরক্ষণের ব্যবস্থাও। বিগত শতাব্দীর প্রায় পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলা নাটকের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়ে এসেছে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পাতায়। বাংলা নাট্য-প্রযোজনার ধারাবাহিক ইতিহাসের হালহদিশ জানতে হলে সেই সেই বিজ্ঞাপনগুলিই আমাদের প্রধানতম ভরসা। কিন্তু তার কোনও সংরক্ষণ কোনও সংগ্রহশালায় নেই। নাট্যশোধ সংস্থান এ-কাজে ব্রতী হয়েছেন বটে কিন্তু তা তাঁরা শুরু করেছেন শতাব্দীর প্রায় শেষ লগ্নে এসে। নাট্য-সংগ্রাহক কমল সাহা তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৯৭০-পরবর্তী সময়ের বিজ্ঞাপনগুলি নোটবুকের পাতায় সংগ্রহ করেছেন বটে, কিন্তু সে-কাজেও আছে অসম্পূর্ণতা। ফলে তাঁর সংগৃহীত তথ্য যাচাই না করে নির্বিচারে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে বিপদ আছে।

বিশ শতকের প্রথমার্ধের নাট্যপত্রিকাগুলি সেকালেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছিল। গবেষক প্রভাতকুমার দাস বিপুল পরিশ্রম করে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ থেকে উদ্ধার করে 'নাট্যমন্দির'-এর সূচি-নির্মাণ করেছেন, 'রঙ্গালয়' নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ একটি প্রবন্ধ লিখেছেন (দুটি লেখাই 'নাট্য আকাদেমি পত্রিকা'-র যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত)। বাকি পত্রিকাগুলির অধিকাংশ সংখ্যাই এখন দুষ্প্রাপ্য। 'নাচঘর' অথবা 'সচিত্র শিশির'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার সম্পূর্ণ ফাইল আজ আর কোথাও নেই। তুলনায় বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা নাট্যপত্রগুলির অবস্থা ততখানি শোচনীয় হয়ে যায়নি। নাট্য আকাদেমির গ্রন্থাগারে ও নাট্যশোধ-এর সংগ্রহশালায়, কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে কিংবা সন্দীপ দত্ত-র লিটল ম্যাগ লাইব্রেরি, কমল সাহা-র নাট্যকোষ পরিষদ কিংবা দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় অনেক পত্রিকার ফাইল-ই সযত্নে রাখা আছে।

পত্রিকার সংগ্রহ যেখানে যা আছে, সেখান থেকে তাকে সম্পাদনা করে মুদ্রিত করা, নাট্য-উপাদান হিসেবে সাজিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতের গবেষকদের পথ প্রশস্ত করাই নাট্য-গবেষকের কাজ। বলা বাহুল্য, এ-কাজে আমরা ভয়াবহরকম পিছিয়ে আছি। ব্যক্তিগত উদ্যোগে আশিস গোস্বামী, মলয় রক্ষিত এবং বাদল সরকার নাট্যচর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রকাশিত সংকলিত-সম্পাদিত উল্লিখিত বই-তিনটি ছাড়া — এ-নিয়ে আর কোনও কাজ আমার চোখে পড়েনি। ড. শিপ্রা দত্তর বইটি আদতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পি-এইচ. ডি. গবেষণা-কর্ম। কিন্তু গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য-সংগ্রহ ও তথ্য বিন্যাসের সুশৃঙ্খল ও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির অভাবে তাঁর বইটি নিছক পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়েছে।

(ঙ) নাট্যজীবনী, ডায়েরি ও স্মৃতিকথা :

> 'গিরিশচন্দ্র' : অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' : রমাপতি দত্ত, 'নাট্যাচার্য শিশিরকুমার' : শংকর ভট্টাচার্য, 'শম্ভু মিত্র ১৯১৫-১৯৯৭ : বিচিত্র জীবন পরিক্রমা'; শাঁওলী মিত্র, 'উৎপল দত্ত : জীবন ও সৃষ্টি' — অরূপ মুখোপাধ্যায়, 'রসরাজের রসকথন' — সম্পাদনা ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মনোমোহন বসুর অপ্রকাশিত ডায়েরি' — সুনীল দাস সম্পাদিত, 'আমার জীবন' — বিনোদিনী দাসী, 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' — অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'হে অতীত কথা কও' এবং 'রঙ্গমঞ্চের রূপতৃষ্ণা' — মহেন্দ্র গুপ্ত, 'গণনাট্য কথা' — সজল রায়চৌধুরী, 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' — অহীন্দ্র চৌধুরী, 'প্রবাসের হিজিবিজি' এবং 'পুরোনো কাসুন্দি' — বাদল সরকার', 'সৃজন কা সুখ দুখ' — প্রতিভা অগরবাল, 'ছায়ায় আলোয়' — তাপস সেন, 'স্মৃতি সত্তা নাট্য' — শ্যামল ঘোষ, 'স্মরণে বিস্মরণে : নবান্ন থেকে লালদুর্গ' — শোভা সেন, 'মায়া ঘোষ : মঞ্চই জীবন' — রুশতী সেন।

নাট্যব্যক্তিত্বদের জীবনী ও আত্মস্মৃতিমূলক রচনা কিংবা ডায়রি নাট্য-গবেষণার আর এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে উঠতে পারে। বাংলা নাট্যজগতে এরকম হীরকোজ্জ্বল কিছু নাট্যজীবনী ও আত্মস্মৃতিকথা লেখা হয়েছে যেগুলি নিছক জীবনী বা নিছক আত্মস্মৃতি হয়েই থেকে যায়নি, হয়ে উঠেছে নাট্য-গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও বিশ্বস্ত তথ্য। উনিশ শতকের নাট্যশালাগুলিতে অভিনয়ের আগে হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে দর্শকদের উদ্দেশে বিলি করা হত। সেই হ্যাণ্ডবিলে অভিনীত নাটকের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু থেকে প্রযোজনার অন্যান্য ডিটেলস্‌ও থাকত। সেই সময়ের কোনও সংস্থা অথবা সংগ্রহশালায় সেই হ্যাণ্ডবিল সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করবার কথা কেউই ভাবেননি। অথচ গিরিশচন্দ্রের জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র কিংবা অমরেন্দ্রনাথের জীবনীকার রমাপতি দত্ত যে পরিশ্রমে, দক্ষতায় এবং দুর্দান্ত মেথডে জীবনের সঙ্গে সময়কাল, নাট্যশালার

সঙ্গে ইতিহাসের ঘটনাবলির ঘাত-প্রতিঘাত এবং নাট্যশালার প্রয়োজনীয় তথ্যাবলিকে জীবন-বিবরণের পাশাপাশি সাল-তারিখ সহযোগে বিন্যস্ত করে দিয়েছেন — সেটা গবেষক-মনন ছাড়া সম্ভব ছিল না। প্রায় প্রতিটি অভিনয়ের সাল-তারিখসহ কোন চরিত্রে কে অভিনয় করেছেন, তার ডিটেলস্ তাঁরা দিয়েছেন। সেই তথ্য ছাড়া গিরিশ যুগ নিয়ে নাট্য-গবেষণা কখনওই দানা বাঁধতে পারত না। ঠিক যেভাবে ইতিহাস ঢুঁড়ে তথ্য ও উপাদানের ঠাসবুননে শিশিরকুমারের নাট্যজীবন লিখেছেন শংকর ভট্টাচার্য, সেটাও একজন প্রকৃত দক্ষ-গবেষক ছাড়া সম্ভব ছিল না। অরূপ মুখোপাধ্যায়ের লেখা উৎপল জীবনীও একই ভাবে জীবনী এবং সমান্তরাল তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস। তুলনায় আমি বলব, শাঁওলী মিত্রের লেখা শম্ভু মিত্রের জীবনী বড় বেশি ব্যক্তিগত আবেগের স্ফুরণ, সে আবেগের কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে গবেষকের নির্বিকারত্ব। বাংলায় নাট্যব্যক্তিত্বদের জীবনী নিয়ে চর্চার অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। এ নিয়ে আমরা ওই চার-পাঁচ ফর্মার ফরম্যাল জীবনীরচনার বাইরে বড় একটা কিছু ভাবিনি।

তুলনায় বাংলা-নাট্যজনদের আত্মস্মৃতিকথা অনেকখানি সমৃদ্ধ। অমৃতলাল বসুর আত্মস্মৃতি কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে যেভাবে সংগ্রহ করেছিলেন বিপিনবিহারী গুপ্ত (বিপিনবিহারী গুপ্ত সম্পাদিত — 'পুরাতন প্রসঙ্গ') কিংবা তাঁর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতিমূলক গদ্যগুলিকে যেভাবে দুই মলাটে গ্রন্থিত করেছিলেন ড. অরুণকুমার মিত্র (অমৃতলাল বসুর 'স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি'), তা ভবিষ্যতের নাট্য-গবেষণার অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। গিরিশযুগের অভিনেতা অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-এর 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' কেবল স্মৃতিকথা নয়, তা যেন থিয়েটারের অন্দরের সমান্তরাল এক ইতিহাসকে ধারণ করেছে। ঠিক একইভাবে শিশিরযুগের আর এক বিখ্যাত পেশাদার অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরীর দুই খণ্ডে লেখা 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' মহাগ্রন্থটি হয়ে উঠতে পারে বাংলা নাট্য-গবেষণার আর একটি আকর। গ্রুপ থিয়েটার পর্বের অন্যতম নির্দেশক-অভিনেতা শ্যামল ঘোষের 'স্মৃতি সত্তা নাট্য', অভিনেত্রী শোভা সেনের 'স্মরণে বিস্মরণে : নবান্ন থেকে লালদুর্গ', আলোক-শিল্পী তাপস সেনের 'ছায়ায় আলোয়' কিংবা প্রতিভা আগরওয়ালের 'সৃজন কা সুখ দুখ' — তেমনই হয়ে উঠতে পারে সাল-তারিখ-বিধৃত ধারাবাহিক ইতিহাসের বাইরে থিয়েটারের সমান্তরাল পথ চলার আর এক অকথিত ইতিহাস। বাদল সরকারের ডায়েরি — 'প্রবাসে হিজিবিজি' এবং চার খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর স্মৃতিকথা — 'পুরোনো কাসুন্দি'-কে বাদ দিয়ে থার্ড থিয়েটার কিংবা বাদলবাবুর উপর গবেষণা কখনই সম্ভব নয়। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রকাশন-সংস্থা থীমা থেকে মানবীকথন সিরিজে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন অভিনেত্রীর জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। জীবনীগ্রন্থ কীভাবে গবেষণার আকর হতে পারে, থীমা-প্রকাশিত শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থিত কেতকী দত্তের সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক জীবনী ('কেতকী দত্ত : নিজের কথায় টুকরো লেখায়' — শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থিত) ও রুশতী সেন লিখিত মায়া ঘোষ-এর জীবনী ('মায়া ঘোষ : মঞ্চই জীবন' — রুশতী সেন) তার খুব বড় প্রমাণ।

(চ) কথোপকথন ও সাক্ষাৎকার :

> 'থিয়েটারের জলহাওয়ায়' — শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদনা : শেখর সমাদ্দার ও মিলি সমাদ্দার), 'শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় : সাক্ষাৎকার সংগ্রহ' — সংগ্রহ ও সম্পাদনা মলয় রক্ষিত, 'আত্মসন্ধানে মগ্ন এক অভিনেতা : মুখোমুখি অনির্বাণ ভট্টাচার্য' — কথোপকথন মলয় রক্ষিত, রঞ্জনকুমার ভৌমিক, 'বিভাস চক্রবর্তী সাক্ষাৎকার' — সম্পাদনা শেখর সমাদ্দার, 'কেতকী দত্ত : নিজের কথায় টুকরো লেখায়' — শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থিত, 'এক বক্তার বৈঠক : শম্ভু মিত্র' — সংগ্রাহক শঙ্খ ঘোষ, 'সমান্তরাল থিয়েটারের ৬ নাট্যব্যক্তিত্ব' (সায়ক নাট্যপত্র

সাক্ষাৎকার সংখ্যা) — সম্পাদনা প্রভাতকুমার দাস, 'যে কথা বলোনি আগে এবছর সেই কথা বলো'; ব্রাত্য বসু, 'শঙ্খ ঘোষ : থিয়েটারের কথা' — গ্রন্থক দেবাশিস মজুমদার।

নাটককার, অভিনেতা, নির্দেশক, নেপথ্য-মঞ্চশিল্পী, নাট্য-সমালোচক, নাট্যগবেষক — থিয়েটারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুক্ত যে-কোনও মানুষের অভিজ্ঞতাকে কথোপকথন অথবা প্রশ্ন-উত্তরের মধ্যে দিয়ে লিখিত ফর্মে ধরে রাখাই এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য। সাক্ষাৎকার এমন এক ধরনের মৌখিক উপাদান, যাকে ঠিকঠাক উপায়ে ডকুমেন্টেশন করতে পারলে তা গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বা তথ্য হয়ে উঠতে পারে। বাংলা থিয়েটারে নাট্য-গবেষণার উপাদান হিসেবে এই ধারাটি অপেক্ষাকৃত নবীন। বলা বাহুল্য বাংলা থিয়েটারের অন্যতম তাত্ত্বিক-প্রবক্তা, নাট্য-সমালোচক, থিয়েটার-অন্ত-প্রাণ শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন্দ্রে রেখে সাক্ষাৎকারের অধিকাংশ কর্মকাণ্ড ঘটেছে এবং সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের কাজও হয়েছে। শেখর সমাদ্দার ও মিলি সমাদ্দার সম্পাদিত 'থিয়েটারের জলহাওয়ায়' এই ধারার পথপথপ্রদর্শক বলা যায়। পরবর্তী সময়ে সাক্ষাৎকার নিয়ে অনেকেই কাজ করেছেন, নাট্যসংস্থা বা দলগুলির উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কথোপকথনের কাজ হয়েছে। সে নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহও বেরিয়েছে, বেরোচ্ছেও। এখনও অসংখ্য সাক্ষাৎকার অপ্রকাশিত অবস্থায় বিভিন্ন নাট্যসংস্থায়, ইনস্টিটিউশনে রয়ে গেছে। নাট্যশোধ সংস্থান এ-বিষয়ে সম্পদের খনি বলা চলে। আমাদের নাট্য-গবেষণার পক্ষে সে-সব সাক্ষাৎকার গুরুত্বপূর্ণ নথি হয়ে উঠতে পারে।

(ছ) নাট্য-প্রবন্ধ, গবেষণা, অলোচনা ও সমালোচনা :

নাটক-থিয়েটার নিয়ে বাকি প্রায় সমস্ত গ্রন্থকেই এই ক্যাটাগরিতে ফেলা যায়। বাংলা নাটক ও থিয়েটার বিষয়ে যে-সব প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, আলোচনা ও সমালোচনার বই প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির তালিকা দীর্ঘতর। তাই এখানে আলাদা করে কোনও গ্রন্থের নাম উল্লেখ করলাম না। নাট্য-গবেষক ও প্রাবন্ধিক হিসেবে হেমেন্দ্রকুমার রায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবকুমার বসু, বিষ্ণু বসু, সাধনকুমার ভট্টাচার্য, অজিতকুমার ঘোষ, শংকর ভট্টাচার্য, কুমার রায়, স্বপন মজুমদার, শঙ্খ ঘোষ, বিভাস চক্রবর্তী, শাঁওলী মিত্র, নৃপেন্দ্র সাহা, পবিত্র সরকার, সৌরীন ভট্টাচার্য, অমিত মৈত্র, রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, চন্দন সেন, প্রভাতকুমার দাস, সত্য ভাদুড়ী, দীপেন্দু চক্রবর্তী, দেবাশিস মজুমদার, সৌমিত্র বসু, শেখর সমাদ্দার, ব্রাত্য বসু, দেবেশ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়।

নাট্য-সমালোচনাকে বলা যেতে পারে 'নাট্য-গবেষণা'-র অন্যতম প্রধান ও বিশ্বস্ত উপাদান, কেন না লাইভ নাট্য-প্রযোজনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসেবে একমাত্র সমালোচকই পারেন সেই নাট্যের সৃষ্ট-মুহূর্তগুলি, তার ভাল-মন্দ ও ভুল-ত্রুটির বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর নাট্য-সমালোচনার বয়ানে ধরে রাখতে। বলে রাখা ভাল, বাংলা নাট্য-সমালোচনার ইতিহাস কিন্তু বেশ সমৃদ্ধ। উনিশ শতকের পত্রপত্রিকায় নাট্য-প্রতিবেদন যতখানি দেখা যায়, সমালোচনা তত নয়। তাছাড়া উনিশ শতকে তো বটেই, বিশ শতকের প্রথম চল্লিশ বছর পত্রিকায় যে-সব নাট্য-সমালোচনা প্রকাশিত হত, সেগুলিতে সাধারণত সমালোচকের নাম থাকত না অথবা খুব কম ক্ষেত্রেই স্বনামে প্রকাশিত হত। তারই মধ্যে 'অনুশীলন' মাসিক পত্রিকায় ১৮৯৪-এ প্রকাশিত শ্রীপ (ছদ্মনাম)-র লেখা 'চন্দ্রশেখর' নাট্যের সমালোচনা এবং শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকারের লেখা 'স্বপ্নের ফুল' এবং 'রজনী' নাট্যদুটির দীর্ঘ নাট্য-সমালোচনা আমাকে বিস্মিত করেছে। বিশ শতকের দু'-এর দশক থেকে শিশিরকুমার ভাদুড়ি-র অলৌকিক প্রভিভায় গুণমুগ্ধ অনেক বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী শিল্পী-সাহিত্যিক নাট্য-সমালোচক হিসেবে উঠে আসেন। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী, রাখালদাস

বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়-এর কথা। গণনাট্য ও তৎ-পরবর্তী যুগের বাংলা নাট্য-সমালোচক হিসেবে যেমন নাট্যাভিনয় ও নাট্য-নির্দেশনার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন আছেন, তেমনই বিশুদ্ধ অর্থে বুদ্ধিজীবী তাত্ত্বিক নাট্য-সমালোচকও আছেন। নাট্যজনদের মধ্যে দেবাশিস দাশগুপ্ত, কেয়া চক্রবর্তী, বিভাস চক্রবর্তী, পবিত্র সরকার, শেখর সমাদ্দার প্রমুখ আছেন, তেমনি নাট্যজগতের বাইরে থাকা ধরণী ঘোষ, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, দীপেন্দু চক্রবর্তী, মনসিজ মজুমদার, আনন্দ লাল, সত্য ভাদুড়ী, সুব্রত ঘোষ, অংশুমান ভৌমিক, প্রিয়নাথ মল্লিক, দীপঙ্কর সেন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

সমস্যার সাতকাহন

বাংলা নাট্য-গবেষণার এই বিপুল সম্ভার দেখে আপাতভাবে মনে হতেই পারে, গবেষণায় আমরা অনেকদূর এগিয়ে গেছি। কিন্তু আসলে তা' নয়, বরং আমরা অনেক কিছুই করে উঠতে পারিনি।

হয়ত থিয়েটারের ধারাবাহিক ইতিহাস একটা নির্মাণ করেছি বটে, কিন্তু সেই ইতিহাসও দেখতে গেলে মূলত মেইনস্ট্রিম থিয়েটার হিসেবে পরিচিত কলকাতার কয়েকটি বড় থিয়েটার হাউসের অথবা প্রধান গ্রুপগুলির প্রতিষ্ঠা-কর্মকাণ্ড ও অবলুপ্তির ধারাবাহিক ইতিহাস মাত্র। এই ইতিহাস থেকে লাইভ-পারফরম্যান্স হিসেবে একটি নাট্য-প্রযোজনার ভাল-মন্দের হাল হদিশ — তার মঞ্চ, মঞ্চ-উপকরণ, দৃশ্যপট, সেট, প্রপ্‌স্‌, কস্টিউম, রূপসজ্জা, আলোর ব্যবহার, অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য, নাচ-গানের নমুনা, দর্শকের উপস্থিতি, টিকিট বিক্রির লাভক্ষতির হিসেব — এসব কিছু খানিকটা পর্যন্ত অনুমান করা যায়, কিন্তু খুব নিশ্চিত করে জানা সম্ভব নয়। এ থেকে কখনোই সম্ভব নয় একটি প্রযোজনার শিক্ষামূলক কোনও পুনর্নির্মাণ করা। আরকাইভাল ডকুমেন্টেশন যাকে বলে, সে যুগের থিয়েটারে তার চেতনা মাত্র ছিল না। ফলে গবেষকদের পক্ষে প্রিজার্ভ করা ডকুমেন্টেশন ছাড়া, আর্কাইভ ছাড়া — একটা সীমানা পর্যন্ত এগোনো সম্ভব, তার বেশি নয়।

১. সমান্তরাল নাট্যচর্চা : প্রেক্ষিত অ্যামেচার থিয়েটার

'শখের থিয়েটার' হিসেবে পরিচিত উনিশ শতকের জমিদারবাবুদের নাট্যচর্চার যে ধারা ১৮৩১-এ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছিল, ১৮৭২-এ বাংলার প্রথম পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই তার ইতি ঘটেছিল? আমাদের ইতিহাস-লেখকরা যদিও এই জলচল বিভাজনেই স্বস্তি বোধ করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটা ইতিহাস তো আর এইরকম সাল তারিখ ধরে স্তব্ধ হয়ে যায়নি। গবেষক অমল মিত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি — মোটামুটি একশো বছরের ব্রিটিশ থিয়েটারের ইতিহাসের বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু, এ-কথাও উল্লেখ করতে ভোলেননি যে, উনিশ শতকের শেষ দিকেও বেশ কিছু ব্রিটিশ থিয়েটার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, যেমন — সেন্ট জেম্‌স থিয়েটার, মিসেস্‌ লুইসের থিয়েটার রয়াল, লিণ্ডসে স্ট্রিটের অপেরা হাউস, ফোর্ট উইলিয়ামের থিয়েটার রয়াল, গ্যারিসন — প্রভৃতি। (অমল মিত্র, পৃ.২১৯ 'কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়', প্রকাশ ভবন, শ্রাবণ ১৩৭৪)

পেশাদার ব্রিটিশ থিয়েটার বন্ধ হলেও ব্রিটিশ-কর্মচারিদের অ্যামেচার ক্লাবগুলির অভিনয় কিন্তু প্রাক্‌স্বাধীনতাকাল পর্যন্ত অল্পস্বল্প হলেও বজায় ছিল। একইভাবে কলকাতার অ্যামেচার থিয়েটারের একটা

খুব বিরাট সমান্তরাল ঐতিহ্যের ধারা ছিল। সেটা সূচনা উনিশ শতকীয় বাবুদের শখের নাট্যচর্চার মধ্যে দিয়ে হলেও পরে তা কলকাতা ছাড়িয়ে দূর-দূরান্তের মফস্‌সলে — কাশিমবাজার, কৃষ্ণনগর, বারাকপুর, বারাসাত, বর্ধমান, ঢাকা, রংপুর, ফরিদপুর — এমনকি বহির্বঙ্গে — কাশী, এলাহাবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল। মাঝে-মধ্যেই কলকাতা থেকে ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল বা বেঙ্গল দলগুলির আমন্ত্রিত অভিনয়ের ডাক পড়ত সেসব মফস্‌সল শহরগুলিতে। মফস্‌সলে অভিনয়ের চর্চা না থাকলে এই আমন্ত্রিত অভিনয়ের ব্যাপারটা সম্ভব হত না। আমরা গবেষকরা হয়তো অনেকেই জানি না, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কাশিমবাজারে একটা নাট্যশিক্ষার আবাসিক স্কুল চালু করেছিলেন। সেই স্কুলটা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮৯৮-এ উনিশ শতকের শেষ দিকে। সক্রিয়ভাবে দশ বছর পরে আরও দশ বছর সেই আবাসিক নাট্যবিদ্যালয়টি টিকে ছিল। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের অনুরোধে গিরিশচন্দ্র জনৈক গোবর্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠিয়েছিলেন এই নাট্যবিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক হিসেবে। সেই গোবর্ধনবাবুর হাতেই বহরমপুরের নাট্যঐতিহ্যের সূচনা বলা যেতে পারে। মণীন্দ্রচন্দ্রের অনুরোধে গিরিশচন্দ্র ঘোষ একাধিক বার কাশিমবাজার গেছেন। সেখানে 'প্রফুল্ল' নাটক অভিনয় করেছেন (মলয় রক্ষিত, পৃ. ৪৫-৬৮ 'বাঙালির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী' সূত্রধর, নভেম্বর ২০১৬)। আমরা কি নাট্যাভিনয়ের এই সমান্তরাল ইতিহাসকে ইতিহাস বলে স্বীকার করেছি? করিনি। তাই তথ্যও সংরক্ষণ করিনি। কলকাতার থিয়েটার আমাদের কাছে 'মেইনস্ট্রিম' আর মফস্‌সল হল 'আদার্স'।

তেমনই বাংলা অ্যামেচার নাট্যধারার একটা আর একটা প্রবাহ উনিশ ও বিশ শতকে পাড়ার আথবা গলির নাট্যচর্চায় খুবই সক্রিয় ছিল। সেটা ক্লাব ও অফিস পাড়ার থিয়েটার এবং গ্রামে-গঞ্জের সমান্তরাল অ্যামেচার অভিনয়ের ধারা। শুধু কলকাতা নয়, হাওড়া, দুর্গাপুর, আসানসোল, রাণীগঞ্জ, কুলটি — শিল্পাঞ্চলগুলিতে এই অফিস-ক্লাবের নাট্যচর্চার একটা সমৃদ্ধ ইতিহাস ছিল। 'অফিস পাড়ার থিয়েটার' নিয়ে, গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে অফিস পাড়ার থিয়েটারের দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক নিয়ে একমাত্র পবিত্র সরকারই তাঁর 'নাটমঞ্চ নাট্যরূপ' বইতে ছোট্ট একটি পরিচ্ছেদে কিছু আলোচনা করেছেন। কিন্তু সেই আলোচনা তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকে পাওয়া। সেটার কোনও ডকুমেন্টেশন তিনি করেননি, এবং কোনও রেফারেন্সও তিনি দেননি। দেননি কেননা, এ-বিষয়ে কোনও তথ্য কোথাও সংগ্রহ করা নেই। (পবিত্র সরকার, 'নাটমঞ্চ নাট্যরূপ' দ্বিতীয় খণ্ড, প্রমা, জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ৪৫-৪৭)। চাইলেও সেই সমান্তরাল নাট্যচর্চা নিয়ে আজ আর কোনও গবেষণা কি সম্ভব?

কলকাতার বাইরে প্রায় প্রতিটি মফস্‌সলে, এমনকি সমৃদ্ধ অনেক গ্রামেও অ্যামেচার নাটকের ক্লাব গড়ে উঠেছিল, অনেক ক্লাবেরই নিজস্ব মঞ্চ গড়ে উঠেছিল, উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সেখানে নিয়মিত অভিনয় হত। প্রধানত কলকাতার বড় দলের জনপ্রিয় প্রযোজনাগুলিই তাঁরা করতেন। কলকাতা থেকে বিশিষ্ট মানুষদের ডেকে এনে তাঁরা অভিনয় দেখাতেন। অনেক অভিনেতারই লক্ষ্য হয়ে উঠত কলকাতার কোনও বিশিষ্ট অভিনেতার অভিনয়-শৈলী হুবহু নকল করা এবং শহরের মানুষকে চমকে দেওয়া। বালুরঘাট ত্রিতীর্থের প্রতিষ্ঠাতা হরিমাধব মুখোপাধ্যায় শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে দিনাজপুরে অ্যামেচার অভিনয়ে কীভাবে কলকাতার 'মডেল' ফলো করা হত তার কৌতুককর বিবরণ দিয়েছেন। ('ইনটিউশনের মধ্যে একটা লজিক আছে', 'শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় : সাক্ষাৎকার সংগ্রহ' — সংগ্রহ ও সম্পাদনা মলয় রক্ষিত, লালমাটি ২০১৯, পৃ. ২৪৩-২৫৫)।

এই চার-পাঁচ দশক আগেও গ্রাম ও সুদূর মফস্‌সলের অনেক অ্যামেচার অভিনয়েই পুরুষরা নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন। বাংলায় পুরুষ অভিনেতার নারী চরিত্রে অভিনয় করার ঐতিহ্য খুবই প্রাচীন। ১৮৭৩-এ বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় শুরু হলেও, কলকাতার বাইরে মফস্‌সল

শহরগুলিতে কিন্তু পুরুষরাই নারী চরিত্রে অভিনয় চালিয়ে যেতেন। পুরুষ-কর্তৃক নারী চরিত্রে অভিনয়ের এটা একটা সমান্তরাল ধারা বলা যেতে পারে, যে ধারার শেষতম প্রতিনিধি চপল ভাদুড়ি। চপলবাবুর জীবন নিয়ে নাটক তৈরি হয়েছে, অভিনয় হয়েছে। আভাষ প্রযোজিত, শেখর সমাদ্দার রচিত ও নির্দেশিত 'সুন্দরবিবির পালা' কিংবা দমদম শব্দমুগ্ধ নাট্যকেন্দ্র প্রযোজিত, রাকেশ ঘোষ নির্দেশিত 'চপল ভাদুড়ি : টেল অফ এ ডেড স্টার'-এর কথা আমাদের মনে পড়বে। কিন্তু এই সমান্তরাল অভিনয়ধারা নিয়ে নেই কোনও তথ্যগত উপাদান, যা নিয়ে আমরা নাট্যগবেষণায় নামতে পারি, উদ্ধার করতে পারি পুরুষ কর্তৃক নারী চরিত্রে অভিনয়ের এই সমান্তরাল ধারার ইতিহাস।

২. সমান্তরাল নাট্যচর্চা : নবনাট্য ও গ্রুপ থিয়েটার

গত শতকের চারের দশকে গণনাট্যের হাত ধরে বাংলা অপেশাদার নাট্যচর্চার আর এক সমান্তরাল ধারা তৈরি হয় যা পরে নবনাট্য বা গ্রুপ থিয়েটারের রূপ নেয়। গণনাট্য আন্দোলন নিয়ে বেশ কিছু বই লেখা হয়েছে। গবেষক দর্শন চৌধুরী-র 'গণনাট্য আন্দোলন' এক ধরনের ডকুমেন্টেশন বললে খুব ভুল বলা হবে না। গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার পিছনের নেপথ্য ইতিহাস থেকে প্রতিষ্ঠা, পথচলা, ভিতরকার দ্বন্দ্ব, ভাঙন এবং ছয়ের দশকে তার পুনরুজ্জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সে বইতে ধরা আছে। গণনাট্য নিয়ে সজল রায়চৌধুরী, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুধী প্রধান, শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের বই থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথি-তথ্য-উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভব। কিন্তু গণনাট্য আন্দোলন নিয়ে যাঁরা আর একটু গভীরে অনুসন্ধান করতে চান, তথ্যের অভাবে তাঁরা আর এক পা-ও এগোতে পারেন না। গণনাট্য গঠন হওয়ার পর সংঘের প্রতিটি সর্বভারতীয় কনফারেন্স-এর কিংবা কলকাতার শাখা সংগঠনগুলির কার্যাবলির বিবরণ, রিপোর্ট অথবা প্রতিবেদন, নিউজলেটার, আজও কোনও সংগ্রহশালায় স্থান পায়নি। ১৯৪৮-র কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ার পর গণনাট্যকর্মীরা প্রায় আত্মগোপন করে ছোট-ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গ্রামেগঞ্জে নাট্যাভিনয় চালিয়ে গেছেন। এই পর্বেই অভিনীত হয়েছে 'নয়ানপুর', 'অহল্যা', 'দলিল', 'বাস্তুভিটা'-র মতো নাটক। গণনাট্য-কর্মী পূর্ণেন্দু পাল বা পানু পালের হাত ধরে ১৯৫১-৫২ পর্বে বাংলা পথনাটকের পথ চলা শুরু। পানু পালের 'ভাঙাবন্দর', 'ভোটের ভেট', 'কত ধানে কত চাল' প্রভৃতি কীভাবে জন-সংযোগ ঘটিয়েছিল, বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'রাহুমুক্ত' শত শত রজনী অভিনীত হয়ে কীভাবে ইতিহাস হয়ে ওঠে; সেসবের কোনও ডকুমেন্টশন আজ পর্যন্ত হয়নি। ওয়ান ওয়াল থিয়েটারের কথা আমরা অনেকেই শুনেছি। কিন্তু কখন কোন সংকট-কালে তৈরি হল এই ওয়ান ওয়াল? কারা অভিনয় করতেন? কী কী নাটক অভিনয় হয়েছে? এসব ইতিহাস জানার জন্য কোনও তথ্য বা উপাদান কি আছে? পথনাটকের সূচনা-পর্বের — বিশেষত অ্যাজিট-প্রপ নাট্যধারার যেমন কোনও নথি পাওয়া যায় না, না অভিনয়ের ডিটেলস্, না অভিনয়ের স্থান-কাল — তেমনই গণনাট্যের বহু নাট্যপ্রযোজনার কোনও হাল-হদিশ চাইলেও পাওয়া যাবে না। 'নয়ানপুর', 'অহল্যা' 'রাহুমুক্ত' প্রভৃতি নাটকের টেক্সট আজ পর্যন্ত সামনে এল না। এই সত্তর বছরে 'গণনাট্যের নাটক' — এই কনসেপ্ট নিয়ে যেমন কোনও নাট্য-সংকলনও সম্ভব হল না, তেমনি সম্ভব হল না গণনাট্য সংঘের গ্রাম-পরিক্রমার কোনও তথ্যগত ইতিহাস তুলে ধরা। এই সমস্ত নথি ও তথ্য হাতের কাছে থাকলে গণনাট্যের একটা পরিপূর্ণ ইতিহাস লেখা সম্ভব হতে পারত।

অবশ্য সমান্তরাল বাংলা নাট্যধারা হিসেবে গ্রুপ থিয়েটারেরও কোনও ইতিহাস এখনও পর্যন্ত রচিত হয়নি। সুনীল দত্ত ('নাট্য আন্দোলনের ত্রিশ বছর') কিংবা স্বাতী লাহিড়ী ('গ্রুপ থিয়েটারের উৎস সন্ধানে')

বেশ কিছু তথ্য-উপাদান সংকলিত করেছেন, যা গ্রুপ থিয়েটার নিয়ে ভবিষ্যতের গবেষকদের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় নথি হতে পারে। যদিও এই তথ্য গ্রুপ থিয়েটারের সম্পূর্ণ ইতিহাস জানার জন্য যথেষ্ট নয়। পাঁচের দশক থেকে কলকাতা ও কলকাতার আশেপাশে যে-অসংখ্য ছোট বড় নাট্যদল গড়ে উঠেছিল, সেই সমস্ত দলগুলির প্রতিষ্ঠা, সদস্য ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রযোজনার তথ্য বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাট্য অভিধানে আছে, কিন্তু সেই তথ্য সম্পূর্ণও নয়, খুব নির্ভরযোগ্যও নয়। গ্রুপ থিয়েটারের ইতিহাস বলতে অনেকেই কলকাতার প্রধান দলগুলির সাল-তারিখ ধরে ধরে নাট্য-প্রযোজনার বিবরণ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যসংকলন মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে সেটা দলগুলির নাট্য-প্রযোজনার ধারাবাহিক বিবরণ মাত্র, কোনোমতেই তা গ্রুপ থিয়েটারের ইতিহাস নয়। 'অভিনয়' পত্রিকার ফাইল ওল্টাতে ওল্টাতে খুব ইন্টারেস্টিং দু-একটি বিজ্ঞাপন চোখে পড়েছিল। যখন নতুন কোনও নাট্যদল জন্ম নেয়, বিজ্ঞাপন দিয়ে সে নাট্যজগতে নিজের পদার্পণ ঘোষণা করে। এরকমই এক নাট্যদলের বিজ্ঞাপনে দেখেছিলাম লেখা আছে — ''আমরা সৎ-নাট্যচর্চায় বিশ্বাস করি", কিংবা ''আমরা ভালো থিয়েটার ভালো করে করায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ"। আবার এমন বিজ্ঞাপনও চোখে পড়ে যেখানে নবীন দলটি সদর্পে ঘোষণা করছে — ''আমরা বিশ্বাস করি একমাত্র থিয়েটারই পারে বিপ্লব নিয়ে আসতে"। সচেতন পাঠক মাত্রই বুঝবেন, এই বিজ্ঞাপনগুলি আসলে ষাট-সত্তরের কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারের বৃহৎ দু-তিনটি দলের নাট্যদর্শনকে অনুসরণ করার কথা বলছে। গণনাট্যের যেমন নিজস্ব নাট্যদর্শন ছিল, গ্রুপ থিয়েটারের তেমনি কোনও সম্মিলিত একক নাট্যদর্শন নেই। বরং গ্রুপ হিসেবে এক একটি দলের নিজস্ব নাট্য-দর্শন আছে। একদিকে ছিল শম্ভু মিত্রের বহুরূপীর নাট্যদর্শন — সৎ থিয়েটারের দর্শন, উৎপল দত্তের এল টি জি-র ছিল বিপ্লবী থিয়েটারের নাট্যদর্শন, আর অজিতেশের নান্দীকার এরকম কোনও বিশেষ নাট্যদর্শনের কথা না বলে ভাল থিয়েটার ভাল করে করার কথা বলেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বহুরূপী এই 'ভাল' থিয়েটার ভালভাবে করার কথা তাদের নাট্যদর্শনে বারেবারে প্রকাশ করলেও নান্দীকার এই দর্শনকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছিল। গ্রুপ থিয়েটার নিয়ে গবেষণা করতে গেলে এই নাট্যদর্শনগুলির কথা মাথায় রাখা জরুরি। কেন না কলকাতার প্রধান দু'চারটে দলকে মডেল করেই বাকি দলগুলি নাট্যচর্চায় ব্রতী হয়েছিল। গ্রুপ থিয়েটারের মজা হল — গ্রুপ হিসেবে প্রত্যেক দলেরই রয়েছে আত্মস্বাতন্ত্রবোধ, সেই আত্মস্বাতন্ত্রকেই তারা রক্ষা করতে চেয়েছে। আবার গ্রুপ থিয়েটার একটা সুবৃহৎ পরিবারের মতোই, সেই সুবৃহৎ পরিবারের সে সদস্যও বটে। ওই পরিবারের সদস্য হিসেবে তারা এক, তাদের নাট্যচর্চার উদ্দেশ্যও এক — সমস্ত শোষিত নিপীড়িত, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের অধিকারের জন্য লড়াই। সেই হিসেবে তারা বৃহৎ এক বামপন্থারই অংশ। এছাড়া বিশেষভাবে যেটা বলার, কলকাতার পেশাদার থিয়েটারের আইডেনটিটি থেকে তারা নিজেদের সযত্নে পৃথক রাখতেই চায়। বাজারি থিয়েটারের দর্শক-মনোরঞ্জন ও লক্ষ্মীলাভের দর্শনকে সে ঘৃণার চোখে দেখে।

গ্রুপ থিয়েটার শুধু কি কলকাতার, মফস্সলের নয়? বহরমপুর, দিনাজপুর, মালদা, জলপাইগুড়ি, কল্যাণী, শান্তিপুর, কাঁচরাপাড়া, মধ্যমগ্রাম, বারাসাত, গোবরডাঙ্গা, বালি, উত্তরপাড়া, বর্ধমান, দুর্গাপুর, কুলটি — প্রায় সর্বত্র ষাট-সত্তর-আশি জুড়ে গ্রুপ থিয়েটারের বিস্তার। ষাট-সত্তরের নাট্য-আন্দোলনের কথা বলতে গেলে মফস্সলের গ্রুপ থিয়েটারের এই উজ্জীবনের কথা বাদ দিয়ে কীভাবে তা সম্পূর্ণ করা যাবে? ত্রিতীর্থ-এর হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের কাজকে কীভাবে এবং কেনই বা কলকাতার থিয়েটারের থেকে পৃথক করে অলোচনা করতে হবে? গ্রুপ থিয়েটারের কুলীনসংসারে মফস্সল চিরকালই 'আদার' হয়ে রইল, কাজেই গ্রুপ থিয়েটারের ইতিহাসে তার কি ঠাঁই হবে?

গ্রুপ থিয়েটারের ইতিহাস লিখতে গেলে, আমাদের সবার আগে যেটা প্রয়োজন, প্রতিটি গ্রুপের

যাবতীয় তথ্য ও উপাদানের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। তথ্য ও উপাদান না পেলে ওই ধারাবাহিক বিবরণের বাইরে বেশিদূর এগোনো সম্ভব নয়।

৩. বাংলা থিয়েটারের দর্শক ও বিনোদনের ইতিহাস

১৯৬৩ সাল নাগাদ 'নবনাট্যের বিচার' ও 'একটি আলোচনা' নামে শম্ভু মিত্র দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধদুটিতে তিনি গ্রুপ থিয়েটারের দিশেহারা গুলিয়ে যাওয়া অবস্থাটা বিচার করতে গিয়ে অভিযোগ করেছিলেন — লক্ষ্মীলাভের বাসনায় নবনাট্য আজ ব্যবসায়িক থিয়েটারের চরিত্রে মিশে যাচ্ছে। বিশেষ করে নাট্যকলার নামে মঞ্চে যে-সব 'হৈ হট্টগোল, সেনসেশন্যালিজম আর যান্ত্রিক স্টান্ট্'-এর আমদানি করা হয়েছে, 'নিখাদ সেন্টিমেন্টের অতীতাশ্রয়ী অভিনয়ভঙ্গীর প্রাদুর্ভাব' হয়েছে, তাতে গভীর কথা বলবার ক্ষেত্রগুলি ক্রমশ সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে বলে তাঁর মনে হয়েছে (শম্ভু মিত্র, 'নবনাট্যের বিচার' ও 'একটি আলোচনা', 'সন্মার্গ সপর্যা' এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রঃ লিঃ, পৃ. ৫৩-৫৮ ও ৬৪-৭২)। দর্শক আকর্ষণ করতে বাংলা গ্রুপ থিয়েটারে এই যে যান্ত্রিক স্টান্ট-এর প্রয়োগ ও সেন্টিমেন্টাল অভিনয়ের অভিযোগ শম্ভু মিত্র করছেন, বাংলা ব্যাবসায়িক থিয়েটারের চরিত্রই ছিল তাই।

আসলে লক্ষ্মীলাভের বাসনায়, দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য আমাদের থিয়েটারে স্টান্টবাজির আশ্রয় নেওয়ার ঐতিহ্য সেই উনিশ শতক থেকেই ছিল। বাংলা থিয়েটারে বিনোদনের ইতিহাস খুবই রঙিন। সেই ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা-পরবর্তী সময় থেকেই দর্শক টানার হরেকরকম উপায় নিয়ে হলগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। এ-বিষয়ে ১৮৭২ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত বাংলা পেশাদার মঞ্চে অভিনয়ের সময় মঞ্চে কী কী উপায় গ্রহণ করা হয়েছিল, শো-শুরুর আগে দর্শকের উপরি পাওনা হিসেবে মঞ্চে আর কী কী দেখানো হত — সেসবের তথ্যগত উপাদান শংকর ভট্টাচার্যের 'বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান' গ্রন্থের তিনটি খণ্ডে বিস্তৃতভাবে পাওয়া যাবে। বাংলা থিয়েটারে দর্শক-মনোরঞ্জনের ইতিহাস লিখতে গেলে সেই তথ্য ছাড়া এক পা-ও এগোনো সম্ভব নয়। শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থে ''দর্শকদের সন্তুষ্টি বিধান; 'আমার পানে চেয়ে চেয়ে খুশি থাকো'" — এই শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদই আছে। সেই পরিচ্ছেদে তিনি বাংলা পেশাদার থিয়েটারের প্রথম পঞ্চাশ বছরের দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য গ্রহণ করা হরেক কিসিমের উপায় — প্রতিযোগিতার বাতাবরণ থেকে মঞ্চে বিদ্যুৎ-বজ্র-বৃষ্টি, চলন্ত রেলগাড়ি, ঘোড়ার পিঠে সওয়ারি ইত্যাদি থেকে শুরু করে ম্যাজিক-স্কেটিং শো, সাইকেল খেলা, ব্যায়াম-প্রদর্শনী, সার্কাস এমনকি বায়োস্কোপ প্রভৃতি হরেক কিসিমের স্টান্টবাজির বিস্তৃত তালিকা দাখিল করে বাংলা পেশাদার থিয়েটারের অর্থনীতির হাল ও দর্শক মনোরঞ্জনের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন (শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ১৮৭২-১৯২০' সাহিত্যলোক, ফেব্রুয়ারি ২০০৯)। বাংলা পেশাদার মঞ্চের প্রথম পঞ্চাশ বছরের এই সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাস লেখা সম্ভব হয়েছে, কেন না, শংকর ভট্টাচার্য বিপুল পরিশ্রমে এইসব তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। কিন্তু এর পরবর্তীকালের দর্শক-মনস্তত্ত্ব কিংবা শম্ভু মিত্র-কথিত ওই স্টান্টবাজির ইতিহাস যদি লিখতে যাই, তথ্য-উপাদানের অভাবে তা লেখা সহজ হবে না।

শিশির-যুগের থিয়েটার নিয়ে অসংখ্য বই লেখা হয়েছে। বাংলা থিয়েটার-ব্যক্তিত্বদের মধ্যে সর্বাধিক চর্চা হয়েছে সম্ভবত শিশিরকুমার ভাদুড়িকে নিয়েই। শিশিরের গুণমুগ্ধ মানুষজনের স্মৃতিকথায় ধরা আছে তাঁর বহু প্রযোজনার এবং শিশিরকুমারের অভিনয়ের অনেক ডিটেলস্। সে-সব লেখা থেকে অনুমান করা যায়, শিশিরযুগেও কোনও কোনও অভিনেতার বিশেষ ম্যানারিজম্ এবং ক্যারিকেচার কম ছিল না। ভূমেন রায়

তো বিখ্যাত ছিলেন সাহেব চরিত্রে অভিনয়ের বিশেষ একটি টাইপ তথা ম্যানারিজম্-এর জন্য। দর্শক-সন্তুষ্টির নানান উপায় ও অভিনয়ের মার-প্যাঁচের জন্য বিখ্যাত ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরীও। 'চিরকুমার সভা'য় চন্দ্রবাবুরূপী অহীন্দ্র চৌধুরীর রসগোল্লার হাঁড়ি শেষ করে আঙুল থেকে রস চেটে চেটে খাওয়া কিংবা 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে অ্যান্টিগোনাসের পিতৃ-পরিচয় জানার পর সেলুকাসরূপী অহীন্দ্রবাবুর জান্তব চিৎকার করা এবং ঠিক আড়াই প্যাঁচ ঘুরে ডিগবাজি খেয়ে তেপায়া টেবিলে আছড়ে পড়া — এসব তথ্য একাধিক সমালোচকের লেখাতে স্থান পেয়েছে। এ থেকে পেশাদার মঞ্চে অহীন্দ্র চৌধুরীর জনপ্রিয়তার কৌশলগুলি অবশ্য চিনে নেওয়া যায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ওই যুগের মঞ্চে দর্শক-মনোরঞ্জনের অ-থিয়েটারি প্রচেষ্টা কী কী ছিল বা আদৌ ছিল কি না, সে জানার সুযোগ আপাতত নেই।

গত শতকের পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কয়েকজন উৎসাহী যুবকের সাংগঠনিক প্রচেষ্টায়, কলকাতার বুকে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন। প্রতি বছর অনুষ্ঠিত এই বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন সর্বার্থেই বাংলার বিনোদন জগতে একটি বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিল। সুশীল সিংহ এবং আরও কয়েকজন উৎসাহী তরুণ বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খুঁজে খুঁজে লোকসংগীত, লোকনৃত্য প্রভৃতি সৃষ্টিশীল শিল্পকলার প্রতিভাশালী শিল্পীদের আবিষ্কার করে কলকাতার বিখ্যাত শিল্পীদের পাশাপাশি তাঁদেরকেও সম্মেলনের মঞ্চে পারফর্ম করার সুযোগ দিতেন। এই সম্মেলনে সংগীতের পাশাপাশি মঞ্চ বেঁধে নাটক অভিনয়ও হত। প্রতিষ্ঠিত গ্রুপগুলির পাশাপাশি অপরিচিত ও উঠতি নাট্যদলগুলির কাছে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের সেই মঞ্চ ছিল নিজেদের প্রতিভা চেনানোর একটা মঞ্চ। যাই হোক, বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন বাংলা থিয়েটারের নতুন এক দর্শক শ্রেণি তৈরি করেছিল, যে দর্শক এতদিন এ-পারের ঘটিদের চোখে ছিল নিতান্ত 'রিফিউজি' মাত্র। দেশভাগের পর ওপার বাংলা থেকে যে-সমস্ত ছিন্নমূল মানুষরা এপারে এসে উদ্বাস্তু হয়েছিলেন — কলকাতা এবং কলকাতার আশেপাশে রেললাইনের পাশে, বস্তিতে, রিফিউজি কলোনিতে — ঝুপড়ি বেঁধে বেঁচে থাকার অসমসংগ্রামে কোনোমতে টিকে ছিলেন, বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন তাঁদের ফেলে আসা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে খানিক ফিরিয়ে দেয়। বাংলা থিয়েটারের নতুন দর্শক ও নাট্যকর্মী এঁদের মধ্যে থেকেই তৈরি হয়েছিল।

বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের মতোই থিয়েটারের দর্শক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে ওঠা আর দু-একটি সংগঠনের উল্লেখ করতেই হয় — তার একটি হল সুশীল সিংহ সংগঠিত 'নাট্য-সম্মেলন'।

'নাট্য-সম্মেলন' ছিল গ্রুপ থিয়েটারের সংগঠন-পর্বের অন্যতম এক প্রচার প্ল্যাটফর্ম। মনোমালিন্যের কারণে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন থেকে বেরিয়ে আসা সুশীল সিংহের ব্যক্তিগত উদ্যোগেই ১৯৬৪-তে উত্তর কলকাতার শ্যামস্কোয়ারে 'নাট্য-সম্মেলন'-এর সূচনা হয়। তৎকালীন বাংলায় সর্ববৃহৎ বাৎসরিক এই নাট্য-উৎসবের সভাপতি ছিলেন মন্মথ রায়, সবিতাব্রত দত্ত ও সুনীল পাল ছিলেন যুগ্ম-সম্পাদক আর সংগঠনের প্রধান কর্ণধার সুশীল সিংহ ছিলেন কোষাধ্যক্ষ। সংগঠনটি চলেছিল মোটামুটি বছরচারেক। প্রথম দু-বছর শ্যামস্কোয়ারে শো হত মঞ্চ বেঁধে। পরের বছর থেকে গোয়াবাগান সি.আই.টি. পার্কে বিভিন্ন মঞ্চে এই উৎসব হয়েছিল। দশ থেকে পনেরো দিন ধরে এই উৎসব চলত। কলকাতার উঠতি গ্রুপগুলির কাছে এই নাট্য-সম্মেলন ছিল নিজেদের প্রতিভা জানান-দেওয়ার একটা বড় মাধ্যম (থিয়েটার একটি ব্যতিক্রমী নাট্যপাক্ষিক', সংকলন ও সম্পাদনা : মলয় রক্ষিত, দে'জ, ২০১৩)। যাই হোক, পঞ্চাশ ও ষাটের বছরগুলিতে বাংলা বিনোদন-সংস্কৃতির ইতিহাসে বঙ্গসংস্কৃতি ছিল একধরনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব। বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের উত্থান, তার সাংগঠনিক বিকাশ এবং দর্শক-তৈরির ইতিহাস লিখতে গেলে 'বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন' ও 'নাট্য-সম্মেলন'-এর গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের নাট্যগবেষণা সেই ক্ষেত্রে একেবারেই নীরব। নাট্য-সম্মেলন নিয়ে অল্প কিছু তথ্য 'থিয়েটার' পাক্ষিকের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হলেও, বঙ্গসংস্কৃতি নিয়ে

কোথাও কোনও নথি তথ্য সংগ্রহ আমরা সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে রাখিনি।

'গিরিশ নাট্য-প্রতিযোগিতা', 'যাত্রা-উৎসব' ইত্যাদির পর রাসবিহারী সরকার তাঁর সাধের বিশ্বরূপায় 'থিয়েটারস্কোপ' নামক রীতির 'বিস্ময়কর উদ্ভাবন' করেও যখন দর্শক টানতে পারছিলেন না, তখন প্রায় মরিয়া হয়েই ১৯৭১-এ নামালেন 'চৌরঙ্গী' এবং মাসিক সাত হাজার টাকার চুক্তিতে নর্তকী কোনির চরিত্রে নিয়ে এলেন ওবেরয় গ্রাণ্ড ও ফিরপোজ-খ্যাত বিখ্যাত ক্যাবারে ড্যান্সার মিস্ শেফালিকে। বাংলা ব্যবসায়িক থিয়েটারে সেই শুরু হল ক্যাবারে নৃত্য প্রদর্শনের খেলা, যা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়বে অন্যান্য মঞ্চগুলিতে এবং মহামারীর মতো গিলে খেতে উদ্যত হবে গোটা ব্যবসায়িক থিয়েটারকেই। সত্তরের মাঝামাঝি সময় থেকে ওই ক্যাবারে নৃত্যের হাত ধরে 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' 'এ' মার্কা রগরগে শরীরী যৌনতা সমস্ত আবরণ ঘুচিয়ে ঢুকে পড়ছে। বিশ্বরূপা থেকে মিনার্ভা, সারকারিনা, বয়েজ ওন লাইব্রেরি, রামমোহন মঞ্চ, কাশী-বিশ্বনাথ, রঙমহল, বিধান মঞ্চ, প্রতাপ মঞ্চ, শ্যামাপ্রসাদ মঞ্চ, রঙ্গনা — প্রায় মহামারীর মতো ছেয়ে গেল পরবর্তী দেড় দশকের বেশি সময়জুড়ে। পেশাদার থিয়েটার ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত চলেছিল সেই মারী। বাম আমলে তথাকথিত এই 'অপসংস্কৃতি'র বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা বাম-সাংস্কৃতিক এবং তৎসহ রাজনৈতিক প্রতিরোধ পেশাদার থিয়েটারের ওই শেষ দুই দশকের ইতিহাসকে প্রায় ধুলো-চাপা করে দিয়েছে বললে ভুল বলা হবে না। আজ চাইলেও পেশাদার মঞ্চে তথাকথিত অশ্লীল থিয়েটার নিয়ে তথ্য-উপাদান কিংবা এ-জাতীয় অভিনয়ের পূর্ণাঙ্গ তালিকা পাওয়া সম্ভব নয়। বাংলা পেশাদার থিয়েটারের একটি বিশেষ সময়ের অবক্ষয় এবং তার অসুখের ও মৃত্যুর কোনও তথ্যমূলক ইতিহাস আপাতত কঠিন হয়ে গেল। (পেশাদার থিয়েটারে তথাকথিত 'ক্যাবারে ও অশ্লীল নাটক অভিনয় নিয়ে এখনও পর্যন্ত দুটি প্রবন্ধ ও একটি বই আমি পেয়েছি। (১) মলয় রক্ষিত, 'পর্নো থিয়েটার : সংস্কৃতির অভূতপূর্ব বিড়ম্বনা', 'গাঙচিল পত্রিকা' পর্নোগ্রাফি সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ৪৯-৭০ (২) অর্ণব সাহা, 'মিস শেফালি : নৈশবিনোদনের সংস্কৃতি যখন বিকল্প শরীরী স্পর্ধা', 'শরীরবিপণি এবং যৌনতা-বিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধ', মৌহারি, ২০২২, পৃ. ১০৪-১২১ (৩) ঐশিকা চক্রবর্তী, 'কলকাতার ক্যাবারে : বাঙালি, যৌনতা এবং মিস শেফালি', গাঙচিল, বইমেলা ২০২০)

৪. নাট্য-প্রতিযোগিতা : এক ধুলো-চাপা স্বর্ণযুগ

আমার ছাত্রবন্ধু সায়ন ভট্টাচার্য অনেকদিন থেকেই একটা বিষয় অনুসন্ধান করে ফিরছে। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাংলার রিফিউজি কলোনিগুলিতে কী-ধরনের নাটকের চর্চা হত, কলোনির নাট্যাভিনয়ের কোনও ইতিহাস লেখা সম্ভব কি না — এ নিয়ে গবেষণা হওয়া অত্যন্ত জরুরি। মোদ্দা কথা হল, রিফিউজি কলোনির থিয়েটার। কিন্তু সায়ন এ-নিয়ে বিশেষ এগোতে পারছে না, কেন না নথি-তথ্য একান্তই অপ্রতুল। আমার একদা সহকর্মী-বন্ধু, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক উত্তম বিশ্বাস রিফিউজিদের নিয়ে ক্ষেত্র-সমীক্ষাভিত্তিক গবেষণা করেন। উত্তম উদ্বাস্তু কলোনির নাট্যচর্চা নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে পেয়েছেন। আশা করি, কলকাতা ও তার আশেপাশের রিফিউজি কলোনির থিয়েটার নিয়ে অনেক কিছুই আমাদের সামনে আসবে।

বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের সংগঠন-পর্বের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা গবেষণা করতে চান, তাঁদের কাছে বিরাট একটা রিসোর্স হতে পারে গত শতকের পাঁচ ও ছয়ের দশক থেকে শুরু হওয়া নাট্য-প্রতিযোগিতা — মূলত একাঙ্ক নাট্য-প্রতিযোগিতা। বিশ্বরূপা থিয়েটারের মালিক রাসবিহারী সরকার ১৯৫৮ থেকে থিয়েটারের উন্নতিকল্পে শুরু করেন 'গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতা'। তাতে কলকাতার উঠতি নতুন গ্রুপগুলি

শো করার সুযোগ পেত। রাসবিহারী সরকারের নামে গ্রুপ থিয়েটারের কর্তাব্যক্তিদের অনেক অভিযোগ আছে, থাকতেই পারে, কিন্তু ১৯৫৮-তে তাঁর পরিকল্পিত গিরিশ নাট্য-প্রতিযোগিতা কিংবা ১৯৬২-তে পরিকল্পিত বিশ্বরূপা যাত্রা-উৎসব বাংলা বিনোদন-সংস্কৃতির ইতিহাসে অত্যন্ত মূল্যবান একটি পদক্ষেপ, সেকথা অস্বীকার করা যায় না। বিশ্বরূপা থিয়েটারের মঞ্চকে তিনি যে একসময় গ্রুপ থিয়েটারের উন্নতিকল্পে কাজে লাগিয়েছিলেন, এই সত্য অস্বীকার করা যায় না। বিশ্বরূপার এই উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ডের ডিটেলস্ কি কোথাও সংরক্ষিত হয়েছে? আমার জানা নেই।

কলকাতা ও কলকাতার আশেপাশের প্রায় প্রতিটি পাড়ায়, কলোনিতে, কলকাতার বাইরে ছোট বড় প্রতিটি মফস্‌সলে ও বড়-গ্রামে, এমনকী রাজ্যের বাইরে — ওড়িশা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, অসম, ত্রিপুরা — যেখানেই বাঙালি পাড়া ছিল — শীতের মরসুমে একাঙ্ক নাটকের প্রতিযোগিতা প্রতিবছর প্রায় উৎসবের মতোই লেগে থাকত। বিশ শতকের নয়ের দশকেও ছোট মফস্‌সলে — এমনকী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্বিভাগীয়-স্তরে — নাট্য-প্রতিযোগিতার রমরমা আমি দেখেছি। উদ্যোক্তা ছিলেন মূলত কোনও পুরনো নাট্যদল, ক্লাব অথবা অন্য কোনও সংস্কৃতিক সংগঠন। স্থানীয় পত্রিকায় সেসবের বিজ্ঞাপন ছাপা হত। লিফলেট বিলি করা হত। কোথাও কোথাও বিজ্ঞাপনদাতাদের টাকায় প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে স্যুভেনির প্রকাশ করা হত। কোথাও তিনদিন কোথাও সাতদিনব্যাপী সেসব প্রতিযোগিতায় রোজ দুটি, কোথাও কোথাও তিনটি করে নাটক অভিনয় হত। কলকাতার গ্রুপগুলি থেকে খ্যাত বা স্বল্পখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্বরা আসতেন সেই সমস্ত প্রতিযোগিতার বিচারক হয়ে। সেরাদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে বক্তৃতা করতেন। বাংলা থিয়েটারের সংগঠন-তৈরিতে এই নাট্য-প্রতিযোগিতার মূল্য ছিল অপরিসীম। এই নাট্য-প্রতিযোগিতার ভিতর থেকেই তৈরি হত ভবিষ্যতের সংগঠক, অভিনেতা ও নেপথ্যনাট্যকর্মী। ছয়ের দশকে এমনই এক একাঙ্ক প্রতিযোগিতায় বিচারকের আসনে বসে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তুলে আনেন প্রতিভাশালী এক যুবক — বিভাস চক্রবর্তীকে। বস্তুত, কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারের নাট্যকর্মীর যোগান আসত ওই নাট্য-প্রতিযোগিতার হাত ধরেই। বাংলা থিয়েটারের দর্শক তৈরিতেও এই প্রতিযোগিতাগুলির একটা বড় ভূমিকা ছিল।

আটের দশকে 'অভিনয়' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় সম্পাদকের পক্ষ থেকে এই মর্মে বিজ্ঞাপন দেওয়া হত : বাংলা ও বাংলার বাইরে যেখানে যত নাট্য-প্রতিযোগিতা হচ্ছে বা হয়েছে, তাঁরা সেই প্রতিযোগিতার ডিটেলস্ — অভিনয়ের তালিকা, প্রতিযোগিতার বিচারক ও পুরস্কার বিজয়ীদের নাম; ইত্যাদি যেন প্রতিবেদনের মতো করে তাঁদের পত্রিকার দপ্তরে পাঠানো হয়। ভবিষ্যতে বাংলা নাট্য-গবেষণার স্বার্থে তাঁরা পত্রিকায় এই প্রতিবেদন প্রকাশ করতে চান। কোনও গবেষক চাইলে এখনও সেসব নথির অনেক-কিছুই উদ্ধার করতে পারেন। নাট্য-গবেষণার জন্য এ কাজ খুবই জরুরি।

৫. পোশাক ও রূপসজ্জা

বাংলা থিয়েটারের সাজপোশাক এবং রূপসজ্জার ইতিহাস উদ্ধার করা খুবই জরুরি। উনিশ শতকের শেষ থেকে নাট্য-অভিনয়ের যে-সমস্ত সমালোচনা ও ফোটোগ্রাফ পাওয়া যায়, এবং নাট্যজনদের যে-সব স্মৃতিকথা লেখা হয়েছে, সেগুলি থেকে সেকালের পেশাদার থিয়েটারের পোশাক ও রূপসজ্জার কিছুটা ধারণা পাওয়া সম্ভব। কোনও কোনও নাট্য-সমালোচনায় তার ডিটেলস হয়ত পাওয়া যাবে। কিন্তু সে-সব থেকে কি পরিপূর্ণ এক ধারাবাহিক ইতিহাস নির্মাণ করা সম্ভব? ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টাকে বাদ দিলে এই-ধারার গবেষণায় আমরা একেবারেই পঙ্গু। সম্প্রতি রোমানা রুমা লিখিত, সত্যজিৎ সম্পাদিত

‘থিয়েটারি কস্টিউম’ নামে একটি বই নিয়ে ফেসবুকে একটি লেখা চোখে পড়েছে। বইটি তাঁরই অধ্যাপকের ক্লাস-লেকচারের প্রায় হুবহু কপি — এমনই অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন লেখক। সে যাই হোক, বাংলা থিয়েটারে কস্টিউম নিয়ে এটাই আমার জানা একমাত্র বই। যদিও বইটি হাতে না পাওয়ায় আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি, বাংলা থিয়েটারে কস্টিউম নিয়ে কোনও ধারাবাহিক ইতিহাসের সন্ধান এ বই দিতে পেরেছে কি না। গিরিশ যুগে কেমন ছিল পোশাক ও রূপসজ্জা? কস্টিউম-শিল্পী ও রূপসজ্জার শিল্পী কারা ছিলেন? জোড়াসাঁকো ও শান্তিনিকেতন-পর্বে রবীন্দ্রনাথের প্রযোজনাগুলিতে পোশাক ও রূপসজ্জার ডিটেলস্ সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে কিংবা প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতিকথায় অনেকখানিই পাওয়া যায়। রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর ‘রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ : সমকালীন প্রতিক্রিয়া’ গ্রন্থে সেই সব নথি ও তথ্য সঞ্চিত আছে। শিশিরকুমারের কোনও কোনও প্রযোজনায় রূপসজ্জা ও পোশাকের ডিটেলস অনেকের বর্ণনায় আছে ঠিকই; সে-সব থেকে শিশিরযুগের পোশাক ও রূপসজ্জা নিয়ে কোনও ইতিহাস কি লেখা হয়েছে? ‘সীতা’ নাটকে কস্টিউম ডিজাইনের পিছনে ছিল সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়েরর গবেষণা, কেমন ছিল সেই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের পোশাক পরিকল্পনা? পোশাক নিয়ে এমনতরো গবেষণা সুনীতিকুমারের মতো পরবর্তীকালে আর কারা করেছিলেন? গ্রুপ থিয়েটারের আমলে খুঁজলে অনেক মেক-আপ শিল্পীরই নাম পাওয়া যাবে, তাঁদের সাক্ষাৎকার কিংবা স্মৃতিমূলক রচনা থেকে সেই ইতিহাসের একটা ফ্রেম হয়ত নির্মাণ করা সম্ভব। কিন্তু কস্টিউমের দায়িত্বে স্বতন্ত্র কোনও শিল্পী কি রাখত দলগুলো? বাংলা গ্রুপ-থিয়েটারে চিরকাল দলেরই কোনও সদস্য ‘কস্টিউম-শিল্পী’র কাজটা চালিয়ে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে সে-সব ইতিহাস, তার নথি তথ্য সংরক্ষণ করে রাখার কথা আমরা কোনোদিন ভাবিনি।

মলয় রক্ষিত : নাট্যগবেষক, প্রাবন্ধিক ও সমালোচক। বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।